আগস্ট ২০২০ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

খোকার দেশের ছবি

মুজিবের বয়ানে মুজিবের কথা

আশিকুর রহমান, পঞ্চম শ্রেণি, গালিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ।

আহিয়ান হক, প্রথম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

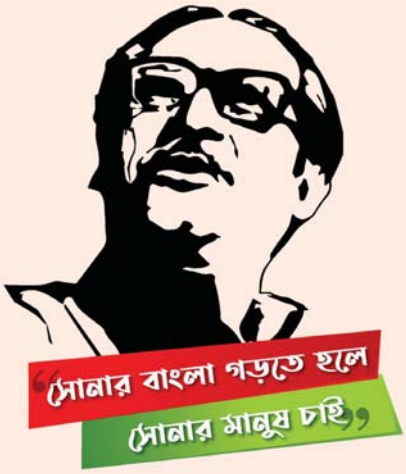

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আগস্ট ২০২০ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

কেমন আছো বন্ধুরা? নবারুণের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি ঈদ মোবারক।

আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জীবনে খুবই অর্থবহ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। সে হিসেবে এ মাসটি শোকেরও। কিন্তু জাতির জন্য এই শোক কোনো শেষ কথা নয়। শোক যে শক্তির উৎস হয় আজকের বাংলাদেশ তার প্রমাণ। আজ বাংলাদেশ সুখী-সমৃদ্ধ দেশের তালিকায়।

শৈশবে বঙ্গবন্ধুর ডাক নাম ছিল খোকা। শৈশব-কৈশোর থেকে এই খোকাই এদেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন সব মানুষকে নিয়ে ভালো থাকার। সহপাঠীদের জন্যও তার দরদ ছিল অপরিসীম। অসহায় বঞ্চিত মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁর কোমলমতি মন সবসময় কেঁদে উঠত। তাঁর এসব গুণাবলির কথা জানা যায় তাঁর নিজের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে।

জাতির পিতাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে ঘাতকের দল ভেবেছিল, বাংলাদেশ কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাদের ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে নিরলসভাবে কাজ করছেন জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি এবং বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে নিজ অবস্থান তৈরি করেছে। বন্ধুরা, দেশকে গড়ে তোলার কাজে তোমরাও আছো। তাই তোমরা পড়ালেখাতে কোনো ফাঁকি দেবে না। তোমরাও একদিন বড়ো হবে। বড়ো হয়ে তোমরাও দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরো অনেক দূর।

ভালো থেকো বন্ধুরা। শুভকামনা রইল।

সূচি

নিবন্ধ

১১ মুজিবের বয়ানে মুজিবের কথা/ড. মোহাম্মদ হাননান
২০ ভোজনরসিক বঙ্গবন্ধু/ বিনয় দত্ত
৩৮ বঙ্গবন্ধুর লেখা চিরকুট/ আতিক আজিজ
৩৯ মুজিববর্ষে শিশু-কিশোর/ নাসরীন জাহান লিপি
৪৭ ছোটোদের বিশ্বকবি/ মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর
৫৭ বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা/মাহফুজুল ইসলাম
৬১ বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসায় শিশুরা/ মেজবাউল হক
৬৩ বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবন/মো. মনজুর হোসেন পাটোয়ারী
৬৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু/ রাশেদুল হক
৬৮ বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধু/ শাহানা আফরোজ
৭০ বঙ্গবন্ধুর অমর কিছু বাণী/ মঞ্জুর করিম খান
৭১ করোনায় মেনে চলবে স্বাস্থ্যবিধি/ নুসরাত হক
৭৩ তরুণ নেতার তালিকা: ছয় বাংলাদেশির মধ্যে চারজনই নারী/জান্নাতে রোজী
৭৪ তেলাপোকার ১৪ পা! / তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৭৫ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায় মো. জামাল উদ্দিন
৭৬ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৭৭ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ
৭৯ বুদ্ধিতে ধার দাও জুলাই ২০২০ -এর সমাধান

ভাষা দাদু

৫০ অভিধান দেখা/ তারিক মনজুর

অ্যালবাম

৩৬ বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক কিছু মুহূর্ত

গল্প

০৩ খোকার দেশের ছবি/সেলিনা হোসেন
১৫ শ্রাবণের কান্না/বিশ্বজিৎ ঘোষ
২৪ সবাই কাঁদছে/ মুস্তাফা মাসুদ
৩১ জয় বঙ্গবন্ধু/ রফিকুর রশীদ
৫২ ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ি/ নুরুল ইসলাম
৫৪ বঙ্গবন্ধু ও রিপন/ আবুল হোসেন আজাদ
৫৮ বালক দলের রাজা/ ইমরুল ইউসুফ

কবিতা

১৯ জিনাত রহমান/মো. মুশফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতা

২৮ মানতাকা তাবাস্‌সুম গুড়িয়া/প্রজীৎ ঘোষ
২৯ মোহাম্মদ ইলইয়াছ/মুহাম্মদ ইসমাঈল মো. সাজ্জাদ আলম
৩০ বেণীমাধব সরকার/তানজিবা হোসেন আনোয়ার হোসেন
৪৬ লিলি হক/আব্দুস সালাম

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আশিকুর রহমান/আহিয়ান হক
শেষ প্রচ্ছদ : মীর্জা মাহের আসেফ
৮০ নুরুন নাহার (নূহা)/আমিমুল ইসলাম বসুনিয়া

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

খোকার দেশের ছবি

সেলিনা হোসেন

ছেলেদের সঙ্গে বাড়ির সামনে দৌড়াচ্ছে খোকা। ছুটোছুটির আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে আছে চেহারা। পথেঘাটে মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই ছুটে গিয়ে হাত ধরে। গাছগাছালি, ফুল, পাখি, খাল-নদীতে দেশের ছবি দেখার আনন্দ আছে ওর। খোকা স্কুলে যায়। আজ স্কুল বন্ধ। দশ বছর বয়সের খোকা হাফ প্যান্ট আর নীল রঙের শার্ট পরে ছুটে এসে দাঁড়ায় শিরীষ গাছের নিচে। ওকে দেখে চারপাশ থেকে চারজন ছেলে এসে ওর পাশে দাঁড়ায়।

একজন বলে, আজ আমাদের স্কুল বন্ধ। আমরা ঘুরব সারাদিন। খোকা হাসতে হাসতে বলে হ্যাঁ, আমরা বনজঙ্গল, মাঠঘাট, খালের পাড়ে গিয়ে টুঙ্গিপাড়ার ছবি দেখব।

- ঠিক বলেছ খোকা।

- এটা কারো হাতে আঁকা ছবি না। এটা দেশের ছবি। সবুজ-শ্যামল দেশ। আমরা অনেক রকম পাখি দেখব, প্রজাপতির পিছে দৌড়াবো, ফুল গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো।

- ঠিক, ঠিক। এটা আমাদের সামনে অন্যরকম ছবি। বইয়ের ছবি না।

-ঠিক বলেছিস রে-

-এমন ছবি দেখতে আমরা তোমার কাছ থেকে শিখেছি খোকা।

তুই আমার প্রাণের বন্ধু।

খোকা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মন্টুকে।

তারপর সবাই হাত ধরে দৌড়ে যায় খাল পাড়ের দিকে। হঠাৎ দূরের দিকে তাকিয়ে খোকা দেখতে পায় গাছের ডালে বসে আছে মাছরাঙা পাখি। খোকা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলে, দাঁড়া সবাই। ওই দেখ পাখি। কি সুন্দর একটি ছবি হয়ে আছে।

রহিম বলে, আমরা কাছে গেলে ওটা উড়ে যাবে। খোকা সবাইকে বলে, আয় আমরা এখানে বসে থাকি। আর পাখির সঙ্গে কথা বলি।

সবাই মিলে গোল হয়ে বসে।

খোকা হাততালি দিতে দিতে বলে, মাছরাঙা, মাছরাঙা বাড়ি তোমার কই? কথা বলো মাছরাঙা আমরা হব সই।

হা হা করে হাসে সবাই। মাছরাঙা চুপচাপ বসে থাকে। মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটায়। খোকা পাখির দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে, আমার বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় তোমার বাড়ি কই ?

বাচ্চারা হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাততালি দিতে দিতে বলে, খোকার বাড়ি টুঙ্গিপাড়া, পাখির বাড়ি কই?

খোকাও হাততালি দিতে দিতে বলে, পাখির বাড়িও টুঙ্গিপাড়ায়, পাখি আমার ছবি।

চলো আমরা পাখিকে আকাশে উড়াই। সবাই মিলে দৌড়ে খালের পাড়ে গেলে দেখতে পায় মাছরাঙা খালের পানি থেকে একটি মাছ ঠোঁটে নিয়ে উড়ে চলে যায়। সামসু চেঁচিয়ে বলে, মাছরাঙা মাছ খায়।

মন্টু ওর হাত টেনে ধরে।

থাম থাম। মাছরাঙা মাছই খাবে। গরু খাবে না।

জানি জানি। মাছরাঙা গরুর পিঠে গিয়ে বসতে পারবে। ঠোঁটে নিয়ে উড়তে পারবে না।

আবার হাসাহাসির বন্যা বয়ে যায়। খোকাও হাসতে হাসতে দূরের দিকে তাকিয়ে থমকে যায়।

আমার স্যার আসছেন। আমাকে বাড়ি গিয়ে পড়তে বসতে হবে। যাই।

ঠিক আছে যা। টুঙ্গিপাড়া পড়তে যা।

কী বললি ? টুঙ্গিপাড়া ?

হ্যাঁ, তুই আমাদের টুঙ্গিপাড়া। তোকে আমরা টুঙ্গিপাড়া ডাকব।

ডাকিস, ডাকিস।

খোকা দৌড়াতে থাকে টিচারের দিকে।

হামিদ স্যার বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে খোকার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ও কাছে এলে হাত ধরে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

কী করছিলি খাল পাড়ে ?

স্যার ছবি দেখেছি।

হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি তো জানি এই গ্রামটায় তুই হাজার রকম ছবি দেখতে পাস।

খোকা মৃদু হেসে স্যারের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। দাঁড়িয়ে বলে, স্যার আজকে কী পড়ব ? স্কুলের বই না বাইরের বইয়ের পাতা।

তুই বল, তোর ইচ্ছা কী?

আজকে বাইরের পড়া শিখব।

শুধু বাইরের কথা না। প্রথমে অঙ্ক করতে হবে। ভূগোল পড়তে হবে।

আচ্ছা স্যার সব পড়া শেষ করব। তারপর হবে বাইরের পড়া।

কালকে কী পড়িয়েছি তা মনে আছে তো ?

আছে স্যার, আছে। কালকে আপনি বিপ্লবী ক্ষুদিরামের কথা বলেছিলেন।

ক্ষুদিরাম কী করেছিল ?

ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল ক্ষুদিরাম।

থাক আর বলতে হবে না।

স্যার ক্ষুদিরামের পড়া আমার খুব ভালো লেগেছে। ব্রিটিশরা ক্ষুদিরামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছিল। ওদের মতো সাহসী ছেলেরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছিল।

অনেক বড়ো ত্যাগ করেছিল না রে ?

স্যার এর চেয়ে বড়ো ত্যাগ আর কি হয়!

সাবাস ছেলে। অনেক বুঝিস।

স্যার ছাত্রের মাথায় হাত রেখে আদর করে। খোকার মাথায় হাত রেখে বাড়ির দিকে হেঁটে যায়।

গাছের ডালে কিচিরমিচির করে পাখি। দুজনে বাড়িতে ঢোকে।

পড়ার ঘরে বইখাতা নিয়ে শুরু হয় পড়ালেখা। টিচার খাতা এগিয়ে দিয়ে বলেন,

এই অঙ্কগুলো করে ফেল।

আজকে বাইরের পড়া কি হবে স্যার ?

গৌতম বুদ্ধের কথা বলব। তিনি তাঁর ধর্ম প্রচারের সময় বলেছিলেন, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

হা হা করে হাসে খোকা। বলে, স্যার জগতের সবাই কি সুখী হতে পারে ?

পারবে না কেন ? সবাই মিলে চেষ্টা করলে অবশ্যই সুখী হতে পারবে।

তাহলে আমিও চেষ্টা করব। আমিও চাই যে সবাই সুখী হোক।

মাস্টার সাহেব খোকার মাথার উপর হাত রেখে বলেন, তোকে দোয়া করি রে সোনা। তুই অনেক বড়ো হবি।

খোকা স্যারের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। তারপর অঙ্ক খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে। স্যার ওর দিকে তাকিয়ে হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। দেখতে পান উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে আসছেন খোকার মা সায়েরা খাতুন। হাতে এক গ্লাস ডাবের পানি। তিনি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে মাস্টার সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দেন।

সায়েরা খাতুন হাতের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলেন, আপনার জন্য ডাবের পানি।

হ্যাঁ, ডাবের পানি আমার খুব পছন্দ। দিন।

মাস্টার সাহেব গ্লাস হাতে নেন। সায়েরা খাতুন ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, বাবা তুই কী খাবি ?

মাগো, আমি তো একটু পরে স্কুলে যাব। তখন আপনার বানানো ঘি দিয়ে গরম ভাত খাব।

ওরে দুষ্টু ছেলে, ভাত খাওয়ার আগে দুধ খেতে হবে। আমি তোর জন্য দুধ নিয়ে আসছি।

মা রান্নাঘরে ঢুকে দুধ নিয়ে আসেন। মাস্টার সাহেব খোকার মাথায় হাত রেখে আদর করে বলেন, ঠিকমতো লেখাপড়া করে অনেক বড়ো হতে হবে।

কেমন করে বড়ো হতে হয় স্যার ?

ভালো করে লেখাপড়া করতে হয়। নিজের দেশকে ভালোবাসতে হয়। মানুষের উপকার করতে হয়। লেখাপড়া তো শুধু বইয়ের পড়া শেখা না। চারপাশের সবকিছু দু-চোখ মেলে দেখতে হয়। গাছপালা, মাঠঘাট, নদী আর মানুষ সবকিছু থেকে পড়ালেখা শিখতে হয়।

আমি সবকিছু শিখব স্যার। আপনি আমাকে দোয়া করবেন। আমি সব পড়া শিখব। একদম মুখস্থ করব।

তুই তো সোনার ছেলে হবি দেখছি। তোকে দোয়া করি রে। মাস্টার সাহেব কাছে দাঁড়ানো সায়েরা খাতুনের দিকে তাকালে দেখতে পান মায়ের অসাধারণ উজ্জ্বল হাসিমুখ। সালাম দিয়ে বলেন, আজকে যাই। সায়েরা খাতুন ঘাড় কাত করেন। মাস্টার সাহেব চলে যান। মা খোকার দিকে দুধের গ্লাস এগিয়ে দিলে খোকা দুহাতে গ্লাস ধরে একটানে দুধ খেয়ে শেষ করে। মায়ের হাতে গ্লাস দিয়ে বলে, গোসল করতে গেলাম।

যা, তাড়াতাড়ি আসিস। স্কুলে যেতে দেরি যেন হয় না।

মাগো, একটুও দেরি হবে না। গেলাম।

দৌড়াতে শুরু করে খোকা। দৌড়াতে দৌড়াতে খাল পাড়ে আসে। দেখতে পায় কয়েকজন ছেলে খালে সাঁতার কাটছে। ওকে দেখে ছেলেরা হাত দিয়ে পানি ছিটায়। পানি ছিটাতে ছিটাতে ছড়া কাটে- খোকা খোকা ডাকে যায়/খোকা যাবে কাদের নায়। আমি যাব তোদের নায়।

পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতার কাটে। ডুবসাঁতার দিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। খালের ওপর উড়ে আসে বক। একজন পানি ছিটাতে ছিটাতে বলে, বক আমাদের বন্ধু। আমাদের সাথে স্কুলে যাবে।

হা হা হাসিতে মেতে ওঠে সবাই।

অনেক গোসল হয়েছে। উঠে পড় সবাই। স্কুলে যেতে হবে না।

হবে, হবে। আমাদের গিমাডাঙ্গা স্কুলে যেতে হবে। স্কুলে যাওয়া মজার খেলা। খোকা মাথা তুলে ধমকের সুরে বলে, খেলা না, স্কুলে যাওয়া, পড়ালেখা করা।

ওঠ সবাই বাড়ি যাই। দেরি হলে মা চিন্তা করবে।

ঠিক, ঠিক।

ছেলেরা খালের পানি থেকে উঠে নিজেদের বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকে। খোকা মাছরাঙা পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে। টু-টু শব্দ করে। পাখি উড়ে যায়। অন্য গাছের কাছে গিয়ে তাকালে দেখতে পায় এক ঝাঁক চড়ুই পাখি কিচকিচ করছে। তখন দ্রুত পায়ে হেঁটে আসে জয়নাল। হাতে গামছা নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে বলে, মা বলেছেন খাল থেকে উঠলে তোমার মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে মুছিয়ে দিতে।

দাও, দাও ভাইয়া।

খোকা ঘাড় নিচু করে মাথা ঝাঁকায়। জয়নাল মাথা-শরীর মুছিয়ে দিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। খোকা দৌড়াতে থাকে। চারদিকের গাছগাছালি, মাঠ-ক্ষেতের দিকে দু-চোখ মেলে তাকায়। মৃদু হেসে নিজেকে বলে, তোমরা সবাই আমার বন্ধু। বন্ধু, বন্ধু বলে হা হা হাসিতে চারিদিক মাতিয়ে তুলে বাড়িতে ঢোকে খোকা।

ঘরে গিয়ে কাপড় বদলায়। স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ভাত খেতে বসে। মা পেতলের থালায় ভাত বেড়ে রেখেছে। খোকা গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটি চামচ দিয়ে ঘি ছড়িয়ে দেন ভাতের ওপর। সঙ্গে একটি বড়ো কই মাছ দেন। বেগুন ভাজিও দেওয়া হয় পাতে। খোকা কই মাছ নাড়াচাড়া করে বলে, স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন আমি কই মাছের কাঁটা বাছতে পারব না।

আমি বেছে দিচ্ছি।

খোকা মায়ের হাত ধরে বলে, না আমি স্কুল থেকে এসে কাঁটা বেছে ভাত খাব। এখন থাক। মাছের বাটিতে মাছটা রেখে দিয়ে ঘি-মাখানো ভাত বেগুন ভাজি দিয়ে খেয়ে শেষ করে। মা খোকাকে গামলায় রাখা পানিতে হাত ধোয়াতে ধোয়াতে বলেন, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করবি না।

আমি তো ঝগড়া করি না মাগো। সবাই আমার বন্ধু।

তোকে দোয়া করি বাজান। মানুষ হয়ে ওঠ।

যাই মাগো।

কাঁধে স্কুলের ব্যাগ ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে খোকা।

সায়েরা খাতুন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলের স্কুলে যাওয়া দেখেন। ও বড়ো গাছের আড়ালে হারিয়ে গেলে তিনি চোখের পানি মোছেন। আঁচল টেনে মাথায় দেন। দেখতে পান চারপাশের বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার জন্য

ছেলেরা বের হয়েছে। সবাই একসঙ্গে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সায়েরা খাতুনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

অন্য ছেলেদের সঙ্গে ধানক্ষেত, পাটক্ষেতের আল ধরে স্কুলে যায় ওরা। কলকলিয়ে কথা বলে। হাসে - যেন স্কুলে যাওয়ার মতো আনন্দ আর হয় না। পাটগাতি বাজারের পাশে গিমাডাঙ্গা স্কুল। এক সময় পৌঁছে যায় সবাই। স্কুলের ঘণ্টা বাজে। বুড়ো দারোয়ানের উজ্জ্বল হাসিমুখ দেখে যে যার ক্লাসে ঢোকে। দারোয়ান নিজেও ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকে। খোকা ক্লাসে ঢোকার আগে হাত তুলে দারোয়ানকে সালাম দেয়। দারোয়ান ঘণ্টার শব্দ জোরে দিলে খোকা হাতে রাখা বইগুলো মাথার উপর তুলে দু-হাত নাড়ায়।

পাটগাতি বাজারের পাশে নদীতে লঞ্চ এসে থামে। লঞ্চ থেকে নামেন শেখ লুৎফর রহমান। তাঁকে দেখে অনেকে সালাম দেয়। তিনি হাসিমুখে উত্তর দেন।

আস্‌সালামু আলাইকুম চাচাজী। আপনি কেমন আছেন? বজলুর সামনে দাঁড়ায়। অন্যরা চলে যায়।

ভালো রে। তোরা ভালো আছিস তো ?

আপনি টুঙ্গিপাড়ায় আসলে আমরা বেশি ভালো থাকি।

শেখ লুৎফর রহমান হা হা করে হাসেন।

তোরা আমাকে অনেক ভালোবাসিস, না রে ?

হ্যাঁ চাচা। আপনি আমাদের মুরুব্বি।

আমার খোকা কই রে ? দেখেছিস?

ও তাই তো। আজকে তো ওর স্কুল খোলা। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, স্কুল ছুটির সময়ও হয়ে এসেছে প্রায়। যাই, বাড়ি যাই।

আপনার ব্যাগটা আমারে দেন।

শেখ লুৎফর রহমানের হাত থেকে ব্যাগটা নেয় বজলুর। তিনি ওর পিঠ চাপড়ে দেন। বলেন, আমাদের গ্রামটা খুব সুন্দর না রে ?

চাচাজী আমার ভাগ্য ভালো যে আমি এই গ্রামের বাসিন্দা। এমন সুন্দর গ্রাম দেশে কি আর আছে ?

আছে, আছে, অনেক আছে। পুরো দেশটাই খুব সুন্দর।

আপনি তো এখন মাদারীপুরে চাকরি করেন ?

হ্যাঁ রে, চাকরির জন্য তো আমাকে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়। ভাবছি এইবার খোকার পরীক্ষা হয়ে গেলে ওকে আমি মাদারীপুর নিয়ে যাব। ওখানকার ইসলামিয়া হাই স্কুলে ভর্তি করে দিব।

আপনি তো থাকেন না। খোকাও যদি না থাকে তাহলে আমার খুব মন খারাপ হবে।

মন খারাপ করিস না। আমার খোকা তোদেরকে খুব ভালোবাসে। ছুটিতে বাড়ি আসবে। তখন ওর সঙ্গে নদীর ধারে, বন-বাদাড়ে, মাঠঘাটে ঘুরে বেড়াবি। ফুটবল খেলবি। খোকা ফুটবল খেলতে ভালোবাসে।

আমি তো রোজই ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। ওকে আমার খুব ভালো লাগে।

দুজনে বাড়িতে ঢোকে।

বেরিয়ে আসেন সায়েরা খাতুন ছোট্টো নাসের ও বোনেরা।

শেখ লুৎফর রহমান নাসেরকে কোলে তুলে নেন। মেয়েদের মাথায় হাত রেখে আদর করেন।

আব্বা আপনি কেমন আছেন ?

ভালো আছি মায়েরা।

ডাবের পানি আনি আব্বা ?

আন যা।

একজন চলে যায়। অন্য জন বাবার ব্যাগ নিয়ে ঘরে যায়। শেখ লুৎফর রহমান নিজের ঘরে গিয়ে বসেন। সায়েরা খাতুন থালায় ভরে পিঠাপুলি নিয়ে আসেন।

বজলুর চলে যায়।

বাড়ির বাইরে এসে শুনতে পায় স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজছে। বজলুর নিজে নিজে বলে, খোকা বাড়িতে এসে আব্বাকে দেখে মেতে উঠবে খুশিতে। যাই ওকে খবরটা দেই।

খোকার সঙ্গে অন্য কয়েক জন ছেলে দলবেধে দৌড়াতে থাকে। এক সময় বজলুর মুখোমুখি হয় সবাই। বটগাছের নিচে দু-হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকে বজলুর।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন বজলুর ভাই ?

তোমার জন্য সুখবর আছে।

সুখবর ? কী খবর বলো বলো।

তোমার আব্বা এসেছেন।

আব্বা, আব্বা, আমার আব্বা- এই তোরা থাক, আমি গেলাম।

খোকা দৌড়াতে থাকে।

অন্যরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। বজলুর বলে, আমি জানতাম আব্বার কথা শুনলে ও এমন পাগলের মতো দৌড়াবে। বন্ধুদের একজন বলে, ও তো ওর আব্বার জানের টুকরা।

এক সময় খোকাকে আর দেখা যায় না। ও বাড়িতে ঢুকে আব্বা, আব্বা বলতে বলতে বারান্দায় ওঠে।

শেখ লুৎফর রহমান দু-হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে টেনে নেন। আদরে ভরিয়ে তোলেন খোকাকে।

সামনে তো বর্ষা আসছে। তোর জন্য একটা ছাতা কিনেছি। স্কুলে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবি। বৃষ্টিতে ভিজবি না। ঠান্ডা লেগে অসুখ করবে।

নতুন ছাতা, নতুন ছাতা। আব্বা আমার নতুন ছাতা।

ওরে দুষ্টু ছেলে!

হাসিতে ভরে যায় ঘর। সবাই মিলে হাসে।

বর্ষা শুরু হয়েছে। প্রবল বৃষ্টি চারদিকে। গাছপালা সবুজ হয়ে উঠেছে। মাঠে খেলতে গেলে খোকা সবাইকে বলে, আমাদের গাছগুলো বর্ষাকালের পানিতে গোসল করে কি সুন্দর হয়েছে।

হা হা করে হাসে ছেলেরা।

তোর জন্য নতুন ছাতা কিনেছে চাচা। তুই নতুন ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যাস।

ভালোবাসা, ভালোবাসা। আব্বার ভালোবাসা।

পরদিন স্কুলের বারান্দায় দেখা হয় তমিজের সঙ্গে। বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে এসেছে। গায়ের জামা ভিজে আছে।

ইশ, তুই তো একদম ভিজে গেছিস রে তমিজ।

কী করব। আমার আব্বা তো ছাতা কিনে দিতে পারে না। আমরা যে গরিব মানুষ।

তমিজ দু-হাতে চোখ মোছে।

আমার ছাতাটি তোকে দিলাম। নে। এখন থেকে তুই আর ভিজে স্কুলে আসবি না। নে-

ছাতাটা বাড়িয়ে ধরলে তমিজ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে ছাতা নেয়।

খোকা বলে, তোর খুশি মুখ দেখে আমার মন ভরে গেল। আমি সারাজীবন মানুষের খুশি ভরা মুখ দেখতে চাই রে তমিজ।

আল্লাহ তোকে বাঁচিয়ে রাখুক বন্ধু।

চল, ক্লাসে ঢুকি।

দুজনে ক্লাসে ঢুকে যায়।

বাড়িতে বাবা-মা, বোনেরা বারান্দায় বসে গল্প করে। থালায় নানারকম খাবার ও কাটা ফল রাখা আছে। টুকটাক খাচ্ছেন শেখ লুৎফর রহমান।

সায়েরা খাতুন বলেন, আজ বাড়িতে খোকা নাই। একজন বোন বলে, ওর স্কুল আছে তো মা। ও তো স্কুল কামাই করে না।

শেখ লুৎফর রহমান বলেন, হ্যাঁ, ছেলেটা সব ছেলেদের মতো না। ও অন্য রকম। ওকে আমি আমার মতো চাকরি করতে দেব না। ওকে আইনজীবী বানাবো। এরপর ওকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করব। পড়ালেখা ভালো করে করবে। আমার ছেলে দেশ চিনতে শিখছে, মানুষ চিনতে শিখছে। আল্লাহ ওকে হাজার বছরের আয়ু দিন, এই দোয়া করি। চারিদিকে বৃষ্টির দৃশ্য ভেসে ওঠে। মাঠঘাট, পথে-প্রান্তরে বৃষ্টি পড়ছে। খালের ধারে বসে আছে বকের দল। উড়ে যাচ্ছে পাখি। ফুটে আছে বুনোফুল।

শীতকাল শুরু হয়েছে। গাছের পাতায় জমে থাকা শিশির টুপটুপ করে ঝড়ে পড়ে। খোকা ছেলেদের নিয়ে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দৌড়ায়।

এক সময় বাড়ি ফিরে স্কুলে যাবার প্রস্তুতি নেয়। খাওয়া শেষ হলে হাত কাটা সোয়েটার পরে বইখাতা নিয়ে উঠোনে নামলে মা বলেন, আজকে তো কনকনে শীত পড়েছে। দাঁড়া, চাদরটা এনে আমি গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছি।

মা ঘরে গেলে খোকা কবুতরগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। খোপের পাশে রাখা টিন থেকে সরিষা ছিটাতে ছিটাতে বলে, বাকবাকুম পায়রা, বাকবাকুম পায়রা। সায়েরা খাতুন চাদর হাতে উঠোনে নেমে আসেন।

খোকা মাকে দেখে কাছে এসে দাঁড়ায়। মা খোকার গায়ে চাদর জড়িয়ে দেন। বলেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসিস, ঠান্ডা লাগতে পারে রে বাবা।

যাই মা।

আয়। মা ছেলের কপালে চুমু দেন। মাকে এক মিনিট জড়িয়ে ধরে রেখে এক ছুটে বাড়ির বাইরে আসে।

বেলা খানিকটা এগিয়ে গেলে দূর থেকে দেখতে পায় একজন বুড়ো গাছের নিচে ভিক্ষা করার জন্য বসে আছে। তার সামনে মাটির বাটি। খোকা কাছে গিয়ে দেখে বুড়ো শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। গায়ে কোনো গরম কাপড় নেই। বাটিতে কিছু খুচরা পয়সা রাখা আছে।

খোকা নিজের গায়ের চাদরটা বুড়োর গায়ে জড়িয়ে দেয়।

বলে, দাদু চাদরটা আপনাকে দিলাম। এটা এখন থেকে আপনার চাদর।

সত্যি! কী বললি রে দাদু ! আমার জন্য এত বড়ো কাজ কেউ করেনি।

আপনার খুশি মুখ দেখে আমার মন ভরে গেছে।

আল্লাহ তোকে বড়ো করুক। তোকে দোয়া করি রে দাদু।

আমি যাই। স্কুলে যাচ্ছি।

খোকা হাঁটতে শুরু করে। বুড়ো ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্কুল শেষে বাড়ি ফিরলে উঠোনেই দেখা হয় বাবার সঙ্গে। শেখ লুৎফর রহমান এগিয়ে এসে বলে, চাদর গায়ে দিয়ে স্কুলে গেলি না ? চাদর কই ? হাত-পা তো ঠান্ডা হয়ে গেছে।

চাদরটা একজন গরিব মানুষকে দিয়েছি আব্বা। বুড়ো দাদু শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল।

তাই ? ওরে আমার সোনারে-

বাবা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। দূরে দাঁড়িয়ে সায়েরা খাতুন ছেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। পায়রাগুলো বাকবাকুম শব্দে ওড়াওড়ি করে।

একদিন খোকার মাস্টারমশাই তাঁকে বলেন, জানিস দেশে ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেছেন গুরু সদয় দত্ত।

ব্রতচারী আন্দোলন কী স্যার ?

নিজের সংকল্পকে কাজে পরিণত করার কঠিন ইচ্ছা হলো ব্রত। যে এভাবে নিজেকে তৈরি করবে তারা ব্রতচারী। এই ব্রতকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। বুঝলি ?

অনেক কঠিন স্যার। বুঝতে পারছি না।

শব্দগুলো মুখস্থ করে রাখ। বড়ো হতে হতে সবকিছু বুঝতে পারবি।

গুরু সদয় দত্ত কেন ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেছেন স্যার ?

আমরা তো পরাধীন জাতি। আমাদেরকে শাসন করে ব্রিটিশরা। আমরা মুক্ত হতে চাই। আমরা স্বাধীনতা চাই।

লাফিয়ে ওঠে খোকা।

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

গুরু সদয় দত্ত দেশকে স্বাধীন করার সংকল্পে দেশের ছেলে–মেয়েদের ব্রতী করার জন্য এই আন্দোলন শুরু করেছেন।

খোকা ঠোঁট কামড়ে চিন্তিত হয়ে বলে, স্যার তাহলে আমাদেরকে স্বাধীনতার জন্য সংকল্প করতে হবে ?

হ্যাঁ,তাই। মনোযোগ দিয়ে নিজেকে স্বাধীনতার ব্রতে যুক্ত করতে হবে। পারবি না?

পারব স্যার, পারব। আমি ব্রতচারী হব।

সাব্বাস, সাব্বাস।

খোকা স্যারকে স্যালুট করে।

আমার আজকের পড়া অন্যরকম পড়া হয়েছে। আমার সংকল্পে আমার টুঙ্গিপাড়া স্বাধীন হবে। টুঙ্গিপাড়া স্বাধীন হলে আমি মা আর আব্বাকে বকুল ফুলের মালা পরিয়ে দেব।

হ্যাঁ, দিবি। যা স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নে। কলকাতা থেকে ব্রতচারী আন্দোলনের দল আসবে। ওরা নাচ-গানের অনুষ্ঠান করবে। তোকে আমি নিয়ে যাব।

কবে আসবে স্যার ?

আগামী রবিবারে। দেশের গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দেবে ওরা।

ওহ, দারুণ হবে। আমি মন দিয়ে গান শুনব। যাই স্যার।

খোকা বারান্দা থেকে লাফিয়ে নামে।

সায়রা খাতুন দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, ওর কী হয়েছে মাস্টার সাহেব ?

ওকে আজ অন্য পড়া শিখিয়েছি। তাই ও খুব খুশি হয়েছে।

কী পড়া শিখালেন ?

ব্রতচারীর পড়া।

ব্রতচারী!

আজ যাই। দু–দিন বাদে আসব। ব্রতচারীর কথা বলব।

স্কুল মাঠে ব্রতচারীর উৎসব শুরু হয়েছে। খোকা সবার সঙ্গে মিলে কাজ করে। ছোটো স্টেজ তৈরি করা হয়েছে। চট বিছিয়ে মাঠে বসার ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা থেকে আসা ছেলেরা হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি ইত্যাদি নিয়ে স্টেজের কাছে আসে। খোকার দিকে তাকিয়ে একজন বলে, বাহ এ তো বেশ কাজের ছেলে। তোমার বাড়ি কোথায় ?

টুঙ্গিপাড়ায়। স্বাধীন টুঙ্গিপাড়া।

তোমার নাম কী?

খোকা।

খোকা তো বাবা-মায়ের আদরের নাম। তোমার আর একটি বড়ো নাম নেই?

আছে। আমি শেখ মুজিবুর রহমান।

নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রতচারী দলের গান বেজে ওঠে। সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। জড়ো হওয়া ছেলে-মেয়েরা দু-হাত তুলে হাত নাড়াতে থাকে।

গান গাওয়া হয় - ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা... ■

মুজিবের বয়ানে মুজিবের কথা

ড. মোহাম্মদ হাননান

নিজ বয়ানে মুজিব চারিত্র্য

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাঝে মাঝে ব্যক্ত করেছেন। এতে তাঁর নিজের কথা আসলেও ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনাও এসেছে। এসেছে তৎকালীন রাজনীতির কথাও:

'আমি খুব রাগী ও একগুঁয়ে ছিলাম', কিছু বললে কড়া কথা বলে দিতাম। কারও বেশি ধার ধারতাম না। আমাকে যে কাজ দেওয়া হতো আমি নিষ্ঠার সাথে সে কাজ করতাম। কোনোদিন ফাঁকি দিতাম না। ভীষণভাবে পরিশ্রম করতে পারতাম। সেইজন্য আমি কড়া কথা বললেও কেউ আমাকে কিছুই বলত না। ছাত্রদের আপদে-বিপদে আমি তাদের পাশে দাঁড়াতাম। কোন ছাত্রের কি অসুবিধা হচ্ছে, কোন ছাত্র হোস্টেলে জায়গা পায় না, কার ফ্রি সিট দরকার, আমাকে বললেই প্রিন্সিপাল ড. জুবেরী সাহেবের কাছে হাজির হতাম। আমি অন্যায় আবদার করতাম না। তাই শিক্ষকরা আমার কথা শুনতেন। ছাত্ররাও আমাকে ভালবাসত। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমান সাহেব জানতেন, আমার অনেক অতিথি আসত। বিভিন্ন জেলার ছাত্রনেতারা আসলে কোথায় রাখব, একজন না একজন ছাত্র আমার সিটে থাকতই। কারণ, সিট না পাওয়া পর্যন্ত আমার রুমই তাদের জন্য ফ্রি রুম। একদিন বললাম, 'স্যার, কোনো ছাত্র রোগগ্রস্ত হলে যে কামরায় থাকে, সেই কামরাটা আমাকে দিয়ে দেন। সেটা অনেক বড়ো কামরা দশ-পনেরো জন লোক থাকতে পারে।' বড় কামরাটায় একটা বিজলি পাখাও ছিল। নিজের কামরাটা তো থাকলই। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, দখল করে নাও। কোনো ছাত্র যেন নালিশ না করে।' বললাম, 'কেউই কিছু বলবে না। দু'একজন আমার বিরুদ্ধে থাকলেও সাহস পাবে না।' *[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৭]।*

ভুল হলে সংশোধন

নিজের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন তিনি, আমার যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনোদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষের হয়েই থাকে। আমার নিজেরও একটা দোষ ছিল, আমি হঠাৎ রাগ করে ফেলতাম। তবে রাগ আমার বেশি সময় থাকত না। *[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৮০]।*

যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হয়

আবার অন্যদের সঙ্গে একটা তুলনা করেছেন নিজের–

'আমি অনেকের মধ্যে একটা জিনিস দেখেছি, কোনো কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না। অনেক সময় করব কি করব না, এইভাবে সময় নষ্ট করে এবং জীবনে কোনো কাজই করতে পারে না। আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয়, সংশোধন করে নেই।

কারণ, যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে, যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।' *[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৮০]।*

অসুখ-বিসুখ ছিল বাল্যকাল থেকেই

বালক বয়স থেকেই তিনি চোখের সমস্যা নিয়ে বড়ো হয়েছেন। তবে অসুখ-বিসুখের সঙ্গে তিনি গুণের কথা বলেছেন,

'১৯৩৪ সালে যখন আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি তখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি।' [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৮] ছোটো সময়ে দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন তিনি। খেলাধুলা করতেন, গান গাইতেন এবং খুব ভালো ব্রতচারী ছিলেন। তবে হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর বাবা তাকে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান। প্রায় দুই বছর তাঁর এইভাবে চলে।

রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল কিশোর বয়সেই

কলকাতা থেকে চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুরে ফিরে এলেন, কোনো কাজ ছিল না, লেখাপড়া ছিল না, খেলাধুলাও না, শুধু একটা মাত্র কাজ ছিল বিকালে রাজনৈতিক সভায় যাওয়া। তখন ছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াতো। মুজিবকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে তাঁর উপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও মুজিবের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হলো। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। সুভাষ বসুর ভক্ত হয়ে গেলেন তিনি। [অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৯] এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করছিলেন মুজিব। অথচ স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেও মেলামেশা করতেন। আর এভাবেই রাজনীতিতে মুজিবের হাতেখড়ি হয়ে গেল।

আবার লেখাপড়ায়, সাথে সেবা সমিতি ও খেলাধুলা

চোখের অসুখটা একটু কমে আসছিল, তাই পিছিয়ে পড়া মুজিব আবার মনোযোগী হলেন লেখাপড়ায়। লিখেছেন মুজিব,

১৯৩৭ সালে আবার আমি লেখাপড়া শুরু করলাম। এবার আর পুরানো স্কুলে পড়ব না, কারণ আমার সহপাঠীরা আমাকে পিছনে ফেলে গেছে। আমার আব্বা আমাকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার আব্বাও আবার গোপালগঞ্জ ফিরে এলেন। এই সময় আব্বা কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি মাস্টার সাহেবকে আমাকে পড়াবার জন্য বাসায় রাখলেন। তার জন্য একটা আলাদা ঘরও করে দিলেন। গোপালগঞ্জের বাড়িটা আমার আব্বাই করেছিলেন। মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন সকল মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন। ঘুরে ঘুরে জায়গিরও ঠিক করে দিতেন। আমাকেই অনেক কাজ করতে হত তার সাথে। হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তখন আমি এই সেবা সমিতির ভার নেই এবং অনেক দিন পরিচালনা করি। আর একজন মুসলমান মাস্টার সাহেবের কাছেই টাকা পয়সা জমা রাখা হত। তিনি সভাপতি ছিলেন আর আমি ছিলাম সম্পাদক। যদি কোন মুসলমান চাউল না দিত আমার দলবল নিয়ে তার উপর জোর করতাম। দরকার হলে তার বাড়িতে রাতে ইট মারা হত। এজন্য আমার আব্বার কাছে অনেক সময় শাস্তি পেতে হত।

আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভালো খেলোয়াড় ছিলাম না, তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভালো অবস্থান ছিল। *[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৯-১০]।*

কৈশোরেই খবরের কাগজ

ঘরেই দুনিয়ার খবর এসে হাজির হতো। কারণ বঙ্গবন্ধুর আব্বা নিয়মিত খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। *[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১০]* ছোটোকাল থেকে সকল কাগজই তিনি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। এর ফলে তাঁর মানসিক বিকাশ অন্যান্যদের চেয়ে দ্রুত ঘটেছে।

আব্বাকে ভয়

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি ভীষণ একগুঁয়ে ছিলেন। তাঁর একটা দল ছিল। কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না। আব্বা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। কারণ ছোটো শহর, নালিশ হত; আব্বাকে তিনি খুব ভয় করতেন। *[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১০]।*

খেলায় বাপ-ব্যাটায় যুদ্ধ

বাবা এবং ছেলে দুজনই খেলোয়াড় ছিলেন। আগে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। বঙ্গবন্ধুর বাবা এবং বঙ্গবন্ধু আলাদা আলাদা দলে খেলতেন। খেলা হলে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না। এমনি একটি খেলার ঘটনা বলেছেন বঙ্গবন্ধু–

'খেলাধুলার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। আব্বা আমাকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না। কারণ আমার হার্টের ব্যারাম হয়েছিল। আমার আব্বাও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। আর আমি মিশন স্কুলের ক্যাপ্টেন ছিলাম। আব্বার টিম ও আমার টিমে যখন খেলা হত তখন জনসাধারণ খুব উপভোগ করত। আমাদের স্কুল টিম খুব ভাল ছিল। মহকুমায় যারা ভাল খেলোয়াড় ছিল, তাদের এনে ভর্তি করতাম এবং বেতন ফ্রি করে দিতাম।

১৯৪০ সালে আব্বার টিমকে আমার স্কুল টিম প্রায় সকল খেলায় পরাজিত করল। অফিসার্স ক্লাবের টাকার অভাব ছিল না। খেলোয়াড়দের বাইরে থেকে আনত। সবই নামকরা খেলোয়াড়। বৎসরের শেষ খেলায় আব্বার টিমের সাথে আমার টিমের পাঁচ দিন ড্র হয়। আমরা তো ছাত্র; এগারজনই রোজ খেলতাম, আর অফিসার্স ক্লাব নতুন নতুন প্লেয়ার আনত। আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আব্বা বললেন, 'কাল সকালেই খেলতে হবে। বাইরের খেলোয়াড়দের আর রাখা যাবে না, অনেক খরচ।' আমি বললাম, 'আগামীকাল সকালে আমরা খেলতে পারব না, আমাদের পরীক্ষা।' গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারি একবার আমার আব্বার কাছে আর একবার আমার কাছে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করে বললেন, 'তোমাদের বাপ ব্যাটার ব্যাপার, আমি বাবা আর হাঁটতে পারি না'। আমাদের

হেডমাস্টার তখন ছিলেন বাবু রসরঞ্জন সেনগুপ্ত। আমাকে তিনি প্রাইভেটও পড়াতেন। আব্বা হেডমাস্টার বাবুকে খবর দিয়ে আনলেন। আমি আমার দলবল নিয়ে এক গোলপোস্টে আর আব্বা তাঁর দলবল নিয়ে অন্য গোলপোস্টে। হেডমাস্টার বাবু বললেন, 'মুজিব, তোমার বাবার কাছে হার মান। আগামীকাল সকালে খেল, তাদের অসুবিধা হবে।' আমি বললাম 'স্যার, আমাদের সকলেই ক্লান্ত, এগারজনই সারা বছর খেলেছি। সকলের পায়ে ব্যথা, দুই-চার দিন বিশ্রাম দরকার। নতুবা হেরে যাব।' এবছর তো একটা খেলায়ও আমরা হারি নাই, আর 'এ জেড খান শিল্ডের' এই শেষ ফাইনাল খেলা...। পরের দিন সকালে খেলা হল। আমার টিম আব্বার টিমের কাছে এক গোলে পরাজিত হল'।

[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৪]।

অঙ্ক-ফোবিয়া

আমাদের অনেকেরই প্রথম জীবন কেটেছে অঙ্কের ভীতিতে। বঙ্গবন্ধুকেও দেখি বাল্যকালে স্কুলে অঙ্ক-ফোবিয়ায় ভুগেছেন:

'১৯৪১ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব। পরীক্ষায় পাস আমি নিশ্চয়ই করব, সন্দেহ ছিল না। রসরঞ্জন বাবু ইংরেজির শিক্ষক, আমাকে ইংরেজি পড়াতেন। আর মনোরঞ্জন বাবু অঙ্কের শিক্ষক, আমাকে অঙ্ক করাতেন। অঙ্ককে আমার ভয় ছিল। কারণ ভুল করে ফেলতাম। অঙ্কের জন্যই বোধহয় প্রথম বিভাগ পাব না। পরীক্ষার একদিন পূর্বে আমার ভীষণ জ্বর হল এবং মামস হয়ে গলা ফুলে গেল। একশ' চার ডিগ্রি জ্বর উঠেছে। আব্বা রাতভর আমার কাছে বসে রইলেন। গোপালগঞ্জ টাউনের সকল ডাক্তারই আনালেন। জ্বর পড়ছে না। আব্বা আমাকে পরীক্ষা দিতে নিষেধ করলেন। আমি বললাম, যা পারি শুয়ে শুয়ে দেব। আমার জন্য বিছানা দিতে বলেন। প্রথম দিনে বাংলা পরীক্ষা। সকালের পরীক্ষায় মাথাই তুলতে পারলাম না, তবুও কিছু কিছু লিখলাম। বিকালে জ্বর কম হল। অন্য পরীক্ষা ভালই হল। কিন্তু দেখা গেল বাংলায় আমি কম মার্কস পেয়েছি। অন্যান্য বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগের মার্কস পেয়েছি। মন ভেঙে গেল'।

[অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৫]। ■

শ্রাবণের কান্না

বিশ্বজিৎ ঘোষ

মাঝ রাতে হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল অর্পার। স্বপ্নটা এখনও ওকে জড়িয়ে আছে। কী দিঘল এক মানুষ – তাঁর তর্জনীর উপর বসে আছে দুটো হলদে পাখি। পাখি দুটো শিস্ দিচ্ছে, আর দিঘল মানুষটা আনন্দে হাসছে। হঠাৎ করে তর্জনীটা আকাশমুখী হতেই পাখি দুটো উড়ে গেল–কান্না পেল দিঘল মানুষটার–ঘুম ভেঙে গেল অর্পার। দিঘল মানুষটার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল ওর। বাইরে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টি। টুপটাপ রিমঝিম শব্দ– কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। কখনও শোনা যায় বাতাসের ডাক। বৃষ্টির শব্দে অর্পা যেন শুনছে হলদে পাখির শিস্; আর বার বার ওর চোখে ভাসছে দিঘল মানুষটার মুখ, তাঁর আকাশ-ছোঁয়া তর্জনী!

শুয়ে আছে অর্পা চুপ করে। মা পাশেই গভীর ঘুমে। বাবা বাড়িতে নেই। বৃষ্টি–হলদে পাখি–দিঘল মানুষ–তর্জনীর আকাশ ছোঁয়া দিঘলতা–বিকেলে বাবার মুখে শোনা গল্প। সবকিছু মিলে ঘুমটা পালিয়ে গেছে অর্পার চোখ থেকে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে অর্পা। স্কুলের বইয়েও পড়েছে বঙ্গবন্ধুর কথা। স্যার কত কথা বলেছেন ক্লাসে। সব ওর মনেও নেই। তাই বিকেলে বাবার কাছে শুনতে চেয়েছে বঙ্গবন্ধুর কথা।

–বাবা, স্যার বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছেন। আমাদের বইয়ে বঙ্গবন্ধুর কথা আছে। তুমি কি বঙ্গবন্ধুর কোনো বইয়ের কথা জানো ?

–হ্যাঁ মা, আমি বঙ্গবন্ধুর দুটো বই পড়েছি। বড়ো হয়ে তুমি পড়তে পারবে।

– আমি তো বড়ো হয়েছি, বাবা।

– হ্যাঁ, তা বটে।

– স্যার বঙ্গবন্ধুর কারাগারের ডায়েরির কথা বলেছেন।

–হ্যাঁ মা, ওই বইটার নাম 'কারাগারের রোজনামচা'।

– তুমি পড়েছ বাবা ?

—হ্যাঁ মা, পড়েছি। আমার কাছে বইটা আছে।

— আমি পড়ব।

— অবশ্যই। বড়ো হয়ে পড়বে। কত কি জানতে পারবে।

—বাবা, আমি বড়ো হয়েছি। আমাকে পড়তে দাও।

—ঠিক আছে। পড়বে। আগে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু গল্প শোনো। তাহলে বইটা পড়ার জন্য তুমি আরো উৎসাহী হবে।

—বলো বাবা।

রাজীব হাসান একে একে অনেক গল্প বললেন অর্পাকে। সামনেই ১৫ই আগস্ট। ১৫ই আগস্টের বেদনার কথা বললেন, বললেন বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কথা, ছোট্ট রাসেলের কথা, দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার কথা। জেলখানায় পাগলদের কথা শুনে অর্পা অনেক কষ্ট পেল। পাগলদের উপর এত অত্যাচার কেন করে জেলের লোকেরা ?

রাজীব হাসান বইটা হাতে নিলেন। কিছুটা পড়ে শোনাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন অর্পাকে। অর্পা তো মহাখুশি। 'বাবা, তাড়াতাড়ি পড়। আমি শুনব।' রাজীব হাসান চশমাটা চোখে দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন :

> একদিন দাঁড়াইয়া পাগলের গোসল দেখছি। এক পাগলের গোসল হয়ে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাচ্ছে। আর একজন পাগলকে কয়েকজন কয়েদি ধরে এনে গোসল করাচ্ছে। যে পাগলটা আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া রোদ পোহাচ্ছে সে আমাকে বলে, 'কি দেখেন, এগুলি সব পাগল, খুব পাগলামি করে।' নিজে যে পাগল তা ভুলে গেছে।

রাজীব হাসান যখন পড়ছিলেন 'কারাগারের রোজনামচা'র শব্দগুলো, অর্পা নিবিষ্ট মনে তা শুনছিল। ও ভাবছে, যে মানুষটা পাগলদের জন্য এত ভালোবাসার কথা বলে, দেশ আর দেশের মানুষকে এত ভালোবাসে, হলদে পাখি এসে বসে যার তর্জনীতে— মানুষ তাঁকে হত্যা করে কেমন করে? 'বাবা, পাখি কি রাজনীতি বোঝে? পাগলরা কি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে?' 'মনে হয় বোঝে' — কথাটা বলেই রাজীব হাসান চোখটা মোছেন। 'বাবা, তুমি কি কাঁদছ?' অর্পার প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পান রাজীব হাসান। 'শোনো মা, বঙ্গবন্ধু মানুষের জন্য, দেশের জন্য এত করেছেন যে, সবাই তাঁকে ভালোবাসে। মানুষের মুক্তির জন্য সারাজীবন তিনি কাজ করেছেন, চৌদ্দটা বছর জেল খেটেছেন। ভাবতে পারো!' বাবার মুখে বঙ্গবন্ধুর গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায় অর্পা। বঙ্গবন্ধুর মুখটা, ৭ই মার্চের তর্জনীটা ভেসে ওঠে অর্পার চোখে।

বাইরে একটানা শ্রাবণের বৃষ্টি। শ্রাবণের বৃষ্টিধারা কী মানুষের কান্না—অর্পা ভাবে। ওর মনে হয় এই শ্রাবণের আকাশ বঙ্গবন্ধুর জন্য কাঁদে। শ্রাবণেই তো চলে গেছেন দিঘল মানুষটা। আরে কী আশ্চর্য! এই শ্রাবণেই তো আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালি চলে গেছেন। অর্পার মনে ভাসে ২২শে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা—এই শ্রাবণেই রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়া। অর্পা আনমনা হয়ে পড়ে। চোখ দুটো কি ভিজে উঠলো? হঠাৎ বাবার মুখে শোনা বঙ্গবন্ধুর গল্পের কথা মনে পড়ল অর্পার। একজন মানুষকে সাধারণ জনতা যে কতটা ভালোবাসতে পারে, তা বুঝাতে গিয়ে রাজীব হাসান এক সন্ধ্যায় অর্পাকে বলেছিলেন : 'নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলে সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারে। বঙ্গবন্ধুর কথাই ভাবো মা।' অর্পা বুঝতে পারছিল না বাবা কী বুঝাতে চাইছেন। 'বাবা, ভালো করে বলো না। দাঁড়াও, তোমার জন্য মা চা বানাচ্ছে। আমি চা নিয়ে আসি।' অর্পা চলে গেলে রাজীব হাসান বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটা আনলেন। 'মা, শোনো, বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার কথা। তুমি এদিকে আসো। মা চা নিয়ে আসবে। তুমি বসো।' চা নিয়ে গীতালি হাসান বাবা- মেয়ের গল্পের মাঝে এসে বসলেন।

—মেয়েকে কী গল্প শোনাচ্ছ? পরে শোনালে হতো না? ওর তো পরীক্ষা সামনে।

—মা, আমার পড়া হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর কথা আমাদের পরীক্ষায় থাকবে। বাবা, বলো তো তুমি বঙ্গবন্ধুর কথা।

— আচ্ছা, বলছি মা। তোমাকে বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষাতেই একটা গল্প শোনাই। মানুষ যে তাঁকে কতটা ভালোবাসে সেই গল্প।

—বাবা-মেয়ে গল্প করো। কাজ আছে, যাই।

বাইরে আজও শ্রাবণের মেঘ শ্রাবণের বৃষ্টি শ্রাবণের কান্না। রাজীব হাসান 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' উলটাতে উলটাতে একটা জায়গায় এসে থামলেন। 'এই যে

পেয়েছি মা।' 'কি বাবা?' 'ওই যে তুমি বঙ্গবন্ধু আর ডাকাতের গল্প শুনতে চেয়েছিলে, সেটা। বঙ্গবন্ধুকে দেশের মানুষ যে কতটা ভালোবাসে, এক ডাকাতের গল্পের কথা বলতে গিয়ে তিনি তা আমাদের জানিয়েছেন।' ডাকাতের কথা শুনে অর্পা শিউরে উঠল। 'বাবা, বঙ্গবন্ধুকে ওই ডাকাত মারেনি তো? 'না রে মা, ডাকাতরা বঙ্গবন্ধুকে মারেনি, মেরেছে অনেক পরে কতগুলো অমানুষ।' 'হ্যাঁ বাবা, আমাদের স্যারও একথাই বলেছেন।' 'তাহলে শোনো সেই ডাকাতের গল্প।' রাজীব হাসান 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন :

> আমরা দুইজন রাত দশটায় একটা এক মাঝির নৌকায় রওয়ানা করলাম। ছোট্ট নৌকা, একজন মাঝি। মধুমতী দিয়ে রওয়ানা করলাম। কারণ, তার বাড়ি মধুমতীর পাড়ে। মধুমতীর একদিকে ফরিদপুর, অন্যদিকে যশোর ও খুলনা জেলা। নদীটা এক জায়গায় খুব চওড়া। মাঝে মাঝে, সেই জায়গায় ডাকাতি হয়, আমাদের জানা ছিল। পানির দেশের মানুষ নৌকায় ঘুমাতে কোনো কষ্ট হয় না। কাজী সাহেব তখনও ঘুমান নাই। এই সময় একটা ছিপ নৌকা আমাদের নৌকার কাছে এসে হাজির হলো। চারজন লোক নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, আগুন আছে কি না? আগুন চেয়েই এই ডাকাতরা নৌকার কাছে আসে, এই তাদের পন্থা। আমাদের নৌকার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'নৌকা যাবে কোথায়? মাঝি বলল, টুঙ্গিপাড়া, আমার গ্রামের নাম। নৌকায় কে? মাঝি আমার নাম বলল। ডাকাতরা মাঝিকে বৈঠা দিয়ে ভীষণভাবে একটা আঘাত করে বলল, 'শালা আগে বলতে পার নাই শেখ সাহেব নৌকায়।' এই কথা বলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে তারা চলে গেল। ... কাজী সাহেব বললেন – 'ডাকাতরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার নাম করেই বেঁচে গেলাম, না হলে উপায় ছিল না।'

বঙ্গবন্ধুর প্রতি ডাকাতের এমন আচরণে অর্পা খুব খুশি। কিন্তু মনে মনে ভাবছিল ও, যে ডাকাতরা বঙ্গবন্ধুর নাম শুনেই চলে গেল, সেই বঙ্গবন্ধুকেই কিনা মারল এদেশের মানুষ। ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অর্পা বাবাকে জিজ্ঞাসা করল। 'তুমি কি কখনো বঙ্গবন্ধুকে দেখেছ?'

– দেখেছি একবার। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে। বঙ্গবন্ধু সেদিন রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিয়েছিলেন।

–বাবা, সে-ভাষণ তো আমরা শুনতে পাই। তুমি সেটা নিজ কানে শুনেছ? কী সৌভাগ্য তোমার?

–হ্যাঁ মা, সে এক ঐতিহাসিক ভাষণ। মাত্র আঠারো মিনিটে সেদিন যে ভাষণ বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন, তা আজ বিশ্ব-ঐতিহ্যের অংশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সেদিনই দিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু।

অর্পার কাছে ৭ই মার্চের ভাষণের কথা বলতে বলতে রাজীব হাসান চলে যান একাত্তরের সেই উত্তাল দিনে, তেলিয়াপাড়ার রণাঙ্গনে। মনে পড়ে, মে মাসে রাতের আঁধারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মা-বাবা জানলে হয়ত যেতে দিতেন না। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রাজীব হাসান। নরসিংদী থেকে অনেক কষ্টে সিলেটের তামাবিল পেরিয়ে তিনি গিয়েছিলেন মেঘালয়ে। সেখানে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। কী ভয়ংকর উত্তেজনায় ভরা সেদিনের প্রতিটা মুহূর্ত। তখন গীতালি ছিল না, ছিল না অর্পা—জীবনের মায়াও ছিল না। একটাই স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে স্বাধীন করা। মনে পড়ে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়ায় চা-বাগানের মধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধের কথা। পাশাপাশি থেকে সেদিন যুদ্ধ করছিল আলতাফের সঙ্গে। সেদিন যুদ্ধে আলতাফকে হারাতে হয়েছে। আলতাফের কথা মনে পড়ে। 'বাবা, তুমি যে অংশটা পড়লে, তার পরের বাক্যটা খুব মজার।' অর্পার কথায় রাজীব হাসান চমকে ওঠেন। আনমনা ভাবের কারণে অর্পা যে ইতোমধ্যে বইটা নিয়ে কিছুটা পড়ে ফেলেছে, তা খেয়াল করেননি রাজীব হাসান। 'কি মা, বলো তো কোন ব্যাপারটা?' 'এই যে বাবা, বঙ্গবন্ধু লিখেছেন : 'আমি বললাম' বোধহয় ডাকাতরা আমাকে ওদের দলের একজন বলে ধরে নিয়েছে।' 'হ্যাঁ মা, মজার কৌতুক। বঙ্গবন্ধুর কৌতুকবোধ ছিল অসাধারণ'—বললেন রাজীব হাসান। 'গোপালগঞ্জের ভাষায় কথা বলতে তিনি পছন্দ করতেন। দেখ না, ৭ই মার্চের ভাষণে কীভাবে গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।' অর্পা শুনছিল বাবার গল্প, আর ভাবছিল বঙ্গবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা।

না, কিছুতেই ঘুম আসছে না অর্পার চোখে। ওই যে উড়ে গেল হলুদ পাখি দুটো—সেই থেকে মনটা কেমন যেন করছে দিঘল মানুষটার জন্য। অর্পার হঠাৎ মনে পড়ল, বাবা ওকে একদিন বঙ্গবন্ধুর লেখা থেকে শুনিয়েছিলেন হলদে পাখির মিষ্টি অভিমানের কথা। সেদিনও ছিল এমনি বৃষ্টি; সেদিনও মধুমতীর জলে ছিল উথাল-পাথাল ঢেউ। বিকেলে রাজীব হাসান অর্পাকে ডেকে বললেন: 'আজ তোমাকে 'কারাগারের রোজনামচা' থেকে পড়ে শোনাব একটা মজার গল্প। আগে তো ডাকাতের কথা শুনেছ, পাগলের কথা শুনেছ, আজ শোনো পাখির জন্য বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসার কথা।' অর্পা মহা খুশি। বাইরে বৃষ্টি, ঠান্ডা বাতাস। গীতালি হাসান মুড়ি আর চানাচুর মেখে দিয়ে গেলেন বাবা-মেয়েকে। বাইরে কাঁঠালিচাঁপার ডালে দুটো কাক ভিজে জুবুথুবু। মুড়ি-চানাচুর খেতে-খেতেই রাজীব হাসান 'কারাগারের রোজনামচা' বইটা তুলে নিলেন হাতে। একটু পরেই বলে উঠলেন : 'এই যে পেয়েছি হলদে পাখির কথা।' অর্পা কৌতূহলী চোখে বলল: 'তাড়াতাড়ি পড় বাবা।' 'শোনো মা'—এই বলে রাজীব হাসান পড়তে শুরু করলেন :

> বহুদিন পর্যন্ত দু'টি হলদে পাখিকে আমি খোঁজ করছি। ১৯৫৮-৫৯ সালে যখন ছিলাম এই জায়গাটিতে তখন প্রায়ই ১০টা/১১টার সময় আসত, আর আম গাছের এক শাখা হতে অন্য শাখায় ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে পোকা ধরে খেত। আজ ৪০দিন এই জায়গায় আমি আছি, কিন্তু হলদে পাখি দু'টি আসলো না। ভাবলাম ওরা বোধহয় বেঁচে নাই অথবা অন্য কোথাও দূরে চলে গিয়াছে। আর আসবে না। ওদের জন্য আমার খুব দুঃখই হলো। যখন ১৬ মাস এই ঘরটিতে একাকী থাকতাম তখন রোজই সকাল বেলা লেখাপড়া বন্ধ করে বাইরে যেয়ে বসতাম ওদের দেখার জন্য। মনে হলো ওরা আমার উপর অভিমান করে চলে গেছে।

হলদে পাখির গল্প শুনতে শুনতে অর্পা উদাস হয়ে যায়। দুটো হলদে পাখির কথা এত বড়ো একজন মানুষ এমন করে কীভাবে মনে রাখতে পারেন? হঠাৎ অর্পার মনে ভিন্ন চিন্তা এল। কাঁঠালিচাঁপার ডালে, আমের শাখায় শাখায় ওড়াউড়ি করত যে পাখি—ওদের ডানায় বঙ্গবন্ধু কী দেখেছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন? পাখি কি স্বপ্ন দেখাতে পারে? হলদে পাখির ডানার মতোই কি দেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধু দিতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতা? তা না হলে জেলখানায় প্রতি সকালে কেন তিনি পাখি দুটোর ওড়াউড়ি দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন, আর কেনই-বা তাদের না দেখে অভিমানের কথা ভাববেন? কাঁঠালিচাঁপার সবুজ পাতার মাঝে ওই হলদে রঙে কি আছে জীবনের বাসন্তী স্বপ্ন? পাখি দুটো কি দিঘল মানুষটার চোখে স্বপ্ন জাগিয়েছিল—মুক্তির স্বপ্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন?

বাইরে শ্রাবণের একটানা কান্না ঝরছে, শোনা যাচ্ছে মেঘের ডাক। ওটা কি দিঘল মানুষটার আর্তনাদ? হলদে পাখি–শ্রাবণের কান্না–কাঁঠালিচাঁপা–আকাশ ছোঁয়া তর্জনী–বাবার মুখ–কারাগারের রোজনামচা–তেলিয়াপাড়ার চা বাগান... ভাবতে ভাবতে অর্পার চোখে ঘুম নামল।

দিঘল মানুষটার তর্জনীতে আবার এসে বসেছে পাখি দুটো–বত্রিশ নম্বরে ঘুমিয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু–বাবার কোলে ছোট্ট রাসেল–বারান্দায় কবুতরের বাক্‌বাকুম–বাড়ির সামনের লেকটায় পুঁটিমাছের ঝিক্‌মিক অবাধ সাঁতার– রেসকোর্স ময়দানের ভায়েরা আমার–টুঙ্গিপাড়ার উদাস বিল–গিমাডাঙ্গার স্কুল মাঠ–বত্রিশ নম্বরের রক্তাক্ত সিঁড়ি–রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই–মিশন স্কুলের সবুজ মাঠ–স্বদেশি আন্দোলন–কলকাতার বেকার হোস্টেল–কারাগারের নির্জন কক্ষ–প্রিয় রেনুর মুখ–হাসুর ভালোবাসা–দেশজোড়া শেখ সাহেব–১৫ই আগস্টের কালরাত–শ্রাবণ শ্রাবণ আর শ্রাবণ–শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় বত্রিশ নম্বেরের সিঁড়ির রক্তে রাঙা বঙ্গোপসাগর–পাগল দফার রহমত–ছয় দফার উত্তাল মিছিল–আগরতলার রাস্তা–আসাদের শার্ট–লাহোরের কারাগার–হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী–জানালার পাশে কবর–আমার সোনার বাংলা–এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম–একে একে অর্পার চোখে ঘুরতে লাগল একটার পর একটা–এলোমেলো সব ছবি। উড়ে-যাওয়া পাখি দুটো আবার এসেছে, তর্জনীতে বসে আছে–হাসছে দিঘল মানুষটা–কাঁদছে আকাশ–বইছে শ্রাবণের ভেজা বাতাস। অর্পা তো অবাক–পাখি দুটো করছে কী? আরে! মানুষটার বুকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে হলদে-জোড়া। একি, কই গেল ওরা–মানুষের বুকের মধ্যে কি হলদে পাখি বাস করে? বুকের মাঝেই কি ওরা গায় স্বাধীনতার গান? বিশাল মানুষটার বুকের মাঝেই কি ওরা পায় কাঁঠালিচাঁপার আশ্রয়? এবার দিঘল মানুষটার সাথে সাথে পাখি দুটোর জন্য অর্পারও কান্না পেল–ঘুমের ঘোরেই মাকে জড়িয়ে ধরে বলল : 'মা হলদে পাখি কি মানুষের বুকে আশ্রয় নেয়? পাখিরও কি থাকে আকাশ-ছোঁয়া অভিমান?'

বাইরে তখনও চলছে শ্রাবণের একটানা কান্না। ■

সোনার বাংলা

জিনাত রহমান

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
টুঙ্গিপাড়া ধাম
বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গেছে
তোমার সেই সুনাম।

গরীব দুখির বন্ধু তুমি
তুমি সবার প্রাণ
তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে
যুদ্ধে দিলো জান।

গড়বো মোরা সোনার বাংলা
এই করিনু পণ
শত বাধায় গাইব মোরা
জয় বাংলার গান।

দশম শ্রেণি, পি. এন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

মো. মুশফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা
আজ মুক্ত স্বাধীন
যেখানে সকলের উন্মুক্ত বিচরণ
নাহি পরাধীন।

ধর্ম-কর্মে সকল জাতি
প্রার্থনা করে যার যার
স্বপ্নের স্বদেশে বইছে শান্তির বাতাস
নেই অশান্তির হাহাকার।

স্বাধীন এ ভূমি ছিল শিকলে বন্দি
নিপীড়ন আর নির্যাতন করেছিল পাকিস্তানি
বঙ্গবন্ধু মুক্ত করেছেন বলেই
সকল বাঙালি তাঁর কাছে ঋণী।

অষ্টম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

নিবন্ধ

ভোজনরসিক বঙ্গবন্ধু

বিনয় দত্ত

বঙ্গবন্ধু ভোজনরসিক ছিলেন। এই তথ্য তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২)' ও 'কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)' পড়লে জানা যায়। তাই বলে তিনি পরিমাণে অনেক বেশি খেতেন না এবং খেতে চাইতেনও না। যা খেতেন তা যেন যথাযথ এবং পরিপাটি হয় তাই চাইতেন। এমনকি রান্নার কৌশলও দেখতেন কীভাবে রান্না হয়।

ছোটোবেলায় বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খাবার ছিল ভাত, মাছের ঝোল আর সবজি। আর খাওয়ার শেষে দুধ-কলা-গুড় না থাকলে তাঁর যেন খাওয়াই পূর্ণ হতো না!

'কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)' এ তিনি লিখেছেন, 'আবার বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি পাকের ঘরে উপস্থিত হলাম। 'দেখি কি পাক করছে?' বাবুর্চি বলল, 'পটল ভাজি করছি, পেঁপে পাক করব। মাছ এখনও আসে নাই।' কিছু সময় দাঁড়াতে হলো। দেখলাম কীভাবে পাক করবে।' [পৃ: ১০৬]

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছেন, 'টেংরা, পুঁটি, পাবদা, সাদা ভাত, ডাল, করলা, মলা আর সবজি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খাবার। সবসময় এগুলো দিয়ে খেতে দেখেছি।'

তবে বঙ্গবন্ধুর অদ্ভুত একটি গুণ ছিল, সবাইকে সাথে নিয়ে খাওয়া। কি কারাগার, কি বাইরে। সব জায়গায় তিনি এই নীতি অনুসরণ করতেন। 'কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)'-এ তিনি লিখেছেন, 'বাবুর্চিকে বলে দিয়েছি কিছু কিছু বাঁচাইয়া একদিন একটু বেশি পাক করে কয়েকজনকে দিও। যাহা হউক যারাই আমার আশে পাশে আছে সকলকেই একদিন না একদিন কিছু দিতে পেরেছি এবং দিতেও থাকব। তবে মেট, ফালতু, বাবুর্চি, আর ছাফাইয়া প্রত্যেক বেলায় ভাগ পায়। এদের রেখে আমি খাই কি করে! আমার পক্ষে সম্ভব নহে।' [পৃ: ১১৬]

এই একই বিষয় জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব মসিউর রহমানের বয়ানে। ২০১৫ সালে জাতীয় জাদুঘরে এক অনুষ্ঠানে মসিউর রহমান বলেন, 'সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিল অসাধারণ। একবার দুপুরের খাবারের সময় একাধিক নবীন কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলে তিনি জানতে চান কর্মকর্তাদের খাওয়া হয়েছে কি না। হ্যাঁ-না ধরনের উত্তর শোনার পর বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তোমরা বসো, খাও'। বঙ্গবন্ধুর খাবার আসত বাড়ি থেকে। টিফিন ক্যারিয়ারে চার-পাঁচজনের খাবার থাকত। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সামনে খাওয়ার সময় কই মাছের কাঁটা আমার (মসিউর রহমান) গলায় বেঁধার অবস্থা হয়েছিল।'

দুই

বঙ্গবন্ধু পিরোজপুর গেলে আফতাব উদ্দিনের বাড়িতে যেতেন। আফতাব উদ্দিনের ছেলে মেজর (অব.) জিয়া উদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খাবার সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিকে বলেন, 'পিরোজপুর এলে আমাদের বাসায় খেতেন। আমার মা শাহিদা বেগমের হাতের রান্না তাঁর ছিল পছন্দের। সাদামাটা খাবারেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। দেশি মাছ যেমন-কই মাছের দোপেয়াজা, মাগুর মাছের ঝোল। শাকের মধ্যে ঢেঁকিশাক। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ পছন্দ ছিল নারকেল-দুধ ও চিংড়ি মাছের সঙ্গে পানিকচু।'

বঙ্গবন্ধুর অভ্যাসে ছিল মুড়ি আর চা। এইটা তিনি বার বার খেতে ভালোবাসতেন। 'কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)'–এ তিনি লিখেছেন, 'চা একটু বেশি খরচ হয়। আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে কিনে আনি।' [পৃ: ১১৬]

একই জায়গায় তিনি লিখেছেন, '১২টায় সিকিউরিটি জমাদার সাহেব এলেন, কিছু বাজার করতে হবে, বিস্কুট চাই, মুড়ি চাই, আমার বাড়িতে মুড়ি খাবার অভ্যাস। বাড়িতে খবর দিলেই পাঠাইয়া দিতো।' [পৃ: ১১৬]

একই বইয়ের আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আমি আমার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং আর একবার চায়ের প্রয়োজন জানালাম। মুড়ি ও চা এসে হাজির হলো। যথারীতি মুড়ি নিধন করিয়া বই নিয়া বসলাম।' [পৃ: ১৫১]

একবার মুড়ি নিয়ে রসবোধের প্রকাশ আর মুড়ি খাওয়ার প্রতি আকুলতা প্রকাশ করেন বঙ্গবন্ধু। 'কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)'-এ তিনি লিখেছেন, 'মুড়ি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কারাগারে। কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ, আদা আর সরিষার তৈল দিয়ে একবার মাখালে যে কি মজা তাহা আমি প্রকাশ করতে পারি না। আমার না খেলে চলে না। সিপাহি জমাদার সাহেবরা যাদের ডিউটি পড়ে তারা মেটকে বলে চুপি চুপি মুড়ি খেয়ে নেয়। যদি বড় সাহেবরা দেখে! আমি দেখেও দেখি না, কারণ মেটকে বলে দিয়েছি মুড়ি চাইলে 'না' বলবা না।' [পৃ: ১৬৫]

তিনি নিজে যেমন চা পান করতে ভালোবাসতেন সবাইকে চা পান করাতেও ভালোবাসতেন। 'কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)'–এ তিনি লিখেছেন, 'চা বানাতে বললাম। আজ যাকে পাওয়া যায় তাকেই চা খাওয়াতে বললাম। সাধারণ কয়েদিরা একটু চায়ের জন্য কত ব্যস্ত। তাই আমি বলে দিয়েছি যে-ই চা খেতে চাইবে তাকেই দিবা। আমার মেটটা একটু কৃপণ, সহজে কিছু দিতে চায় না। যদি আমার কম পড়ে যায়, বাইরের থেকে আসতে দেরি হলে অসুবিধা হবে। তাকে বলে দিয়েছি, কম পড়ে পড়ুক, আনতে দেরি হয় হউক, চাইলে দিতে হবে। কিইবা আমি দিতে পারি, এই নিষ্ঠুর কারাগারে!' [পৃ: ১১৮]

২০১৬ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমানের 'কাছ থেকে দেখা ১৯৭৩-১৯৭৫' বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'দু-এক

বঙ্গবন্ধু কই মাছ খেতে খুব পছন্দ করতেন। একসঙ্গে দুই-তিনটা কই মাছ খেয়ে ফেলতেন। ওইদিনও বঙ্গবন্ধু তিনটা কই মাছ খেয়ে ফেলেছেন। তখনো আমি একটা কই শেষ করতে পারিনি। এমন সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রে খেতে পারছিস না। দে আমি কাঁটা বেছে দিচ্ছি। বলেই আমার মাছটা নিয়ে কাঁটা বেছে দিলেন।

মিনিটের মধ্যে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলেন খাবার টেবিলে। আমার জন্যও একটি প্লেট- সামনাসামনি। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ছিল। কিছু সবজি, ইলিশ মাছের মাথাসহ দু-এক টুকরা মাছ ও ডাল। কেউ জানত না, বঙ্গবন্ধুর মেহমান থাকবে। তাই রোজকার মতো খাবারই তাঁর জন্য পাঠানো হয়েছে। অতিথির জন্য সে খাবার যথেষ্ট উঁচুমানের হবে না মনে করে বঙ্গবন্ধু ক্ষণিকের জন্য হলেও অপ্রতিভ হলেন। বললেন, 'খলিল, তোমরা তো অনেক ভালো খাও। তোমাকে ডেকে এনে আজ একটু অভুক্তই রাখব হয়তো। কিন্তু এটাও দেখে যাও, তোমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কী খায়।'

খাওয়া শুরু হলো। সবজি খাওয়া শেষ হলে দুই টুকরা মাছ তিনি নিজেই দুই পাতে দিলেন। ইলিশের মাথাটা সকলে পছন্দ করে না বেশি কাঁটা বলে। আবার যারা পছন্দ করে, তাদের প্রিয় খাদ্য এই মাথা। বঙ্গবন্ধুর জন্য পাঠানো হয়েছে বলে বুঝলাম যে ইলিশের মাথা তাঁর প্রিয়। বললাম, 'স্যার, আপনি মাথাটা খান। আমি মাথা বিশেষ পছন্দ করি না।' কথাটা মিথ্যে, আসলে আমি নিজেও পছন্দ করি। হয়তো বুঝতে পারলেন, কিংবা একা মাথাটা খাওয়া কিছুটা স্বার্থপরতার মতো দেখাবে মনে করে মাথাটা তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে দুই ভাগে ভাগ করলেন এবং এক ভাগ আমাকে দিলেন। ব্যাপারটি ছোটো কিন্তু মনে রাখার মতো।'

বঙ্গবন্ধু চীন সফরে গিয়েছেন। সেইখানে তাঁর খাবার অসুবিধা শুরু হলো। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২'-এ তিনি লিখেছেন, 'চীনা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা তারা জানে না। ইন্টারপ্রেটার সাথেই আছে। খেতে শুরু করলাম, কিন্তু খাবার উপায় নাই। ভীষণ ঝাল। দু'এক টুকরা রুটি মুখে দিয়ে বিদায় হলাম। যা কিছু খেয়েছিলাম তার ধাক্কা চলল, পেটের ব্যথা শুরু হল। রুমে আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলফলারি ছিল, তাই খেয়ে আর চা খেয়ে রাত কাটালাম।' [পৃ: ২২৬]

খাবার কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পরবর্তীতে তিনি মাহাবুব এবং তার স্ত্রী'র সঙ্গ নিলেন। একই বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'যে কয়দিন পিকিংয়ে ছিলাম, রাতে আমি ওদের সাথেই খেতাম। বাংলাদেশের খাবার না খেলে আমার তৃপ্তি কোনদিনই হয় নাই।' [পৃ: ২২৮]

এই পিকিং-এ খাবার অসুবিধা নিয়ে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় ২০১৩ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আনিসুল হক-এর 'উষার দুয়ারে' বইতে। তিনি লিখেছেন, 'মুজিব খুবই বাঙালি খানার অভাব অনুভব করছেন। সেই সমস্যার আলৌকিক সমাধান হয়ে গেল। মুজিব পেয়ে গেলেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহপাঠী মাহাবুবকে, যে কিনা পিকিংয়ের পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারির পদে নিয়োজিত। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মাহাবুব চলেছেন সস্ত্রীক, হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেয়ে মুজিব চিৎকার করে উঠলেন, 'মাহাবুব, মাহাবুব'; বাঙালি-বিরল চীনা রাস্তায় তাঁর নাম ধরে কে ডাকছে-মাহাবুব চমকে উঠে তাকিয়ে দেখতে পেলেন মুজিবকে, এসে জড়িয়ে ধরলেন। এর পর থেকে মাহাবুবের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করতেন।

১৫ বছর পর মুজিব সেই স্মৃতি উল্লেখ করে লিখলেন, 'যে কয়দিন পিকিংয়ে ছিলাম, রাতে ওদের বাড়িতেই খেতাম। বাংলাদেশের খাবার না খেলে আমার তৃপ্তি কোনো দিনও হয় নাই।' [পৃ: ১২৭]

তিন

পশ্চিম পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন আব্দুল মালেক। তাদের পাকিস্তানের লায়েলপুর মিয়াওয়ালি কারাগারে রাখা হয়। আব্দুল মালেকের সেই স্মৃতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। মালেক বলেন, 'পোকাযুক্ত ভাত স্যার খেতেই পারতেন না। ভাতের জন্য তিনি বিদ্রোহ করেন। জেল কর্তৃপক্ষকে জানান ভাত খাবেন না। তাকে রুটি দিতে হবে। তখন একজন আর্মি অফিসার জেলখানায় আসে। সে বঙ্গবন্ধুকে বলে, তুমি ভাত খাওয়ার জন্য দেশকে টুকরো টুকরো করেছ। তোমাকে পোকাওয়ালা ভাতই খেতে হবে। রুটি আমাদের খাবার, আমরা রুটি খাব।'

মুজাফফর হোসেন পল্টু ছিলেন তৎকালীন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। সেই সময় তিনি বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন ও ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। একটি জাতীয় দৈনিকে তিনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, 'উনার সঙ্গে ভাত খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। দুপুরে যে ক'দিন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেছি, উনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করতেন- কীরে খেয়েছিস? একদিন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি, তিনি ভাত খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, বয় ভাত খা। সেদিন বঙ্গবন্ধু কই মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কই মাছ খেতে খুব পছন্দ করতেন। একসঙ্গে দুই-তিনটা কই মাছ খেয়ে ফেলতেন। ওইদিনও বঙ্গবন্ধু তিনটা কই মাছ খেয়ে ফেলেছেন। তখনও আমি একটা কই শেষ করতে পারিনি। এমন সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রে খেতে পারছিস না। দে আমি কাঁটা বেছে দিচ্ছি। বলেই আমার মাছটা নিয়ে কাঁটা বেছে দিলেন। কী অসাধারণ মনের মানুষ!'

বঙ্গবন্ধুর মাছ খাওয়ার গল্প পাওয়া যায় ২০১৩ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত আনিসুল হক'এর 'উষার দুয়ারে' বইতে। তিনি লিখেছেন, 'মুজিব স্বস্তি পেলেন। রাতের বেলা তাঁতীবাজারের বাসায় আবদুল হামিদ চৌধুরী আর মোল্লা জালাল উদ্দীনের সাথে কথা বললেন এই নিয়ে। মেঝেতে মাদুর পেতে টিনের থালায় ভাত খাচ্ছেন তাঁরা।

মুজিব বললেন, 'আজকা আমি শান্তি নিয়া ঘুমাতে যাব, বুঝলা। লিডারের অ্যাফিলিয়েশনটা হয়ে গেল। আর লিডার যে বাংলা আর উর্দু-দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা চান, সরকারের জুলুম-নির্যাতন-গুলির প্রতিবাদ করেন, এইটাও আজকে পার্টির লোকেরা জানল। মানিক ভাইকে বিবৃতি দিয়া আসলাম। ইত্তেফাক-এ বার হলে দেশের মানুষ জানবে।'

মোল্লা জালাল বললেন, 'ইত্তেফাক এখন খুব চলে। যেইখানে যাই সেইখানেই দেখি লোকে ইত্তেফাক পড়ে। আরেকটা মাছ লও, মুজিবর।'

মুজিবের পাতে মাছ তুলে দিলেন মোল্লা জালাল।

শেখ মুজিব বললেন, 'দাও আরেকটা। আজকা আমার ক্ষুধাও বেশি। আজকা আমি দুইটা মাছ খেতে পারব।' [পৃ: ১০০]

খাবার নিয়ে এই রকম অসংখ্য অসংখ্য গল্প জানা যায়। এইসব গল্প করেন তাঁর ভক্ত, অনুজরা। সেইসব গল্প করে তারা তৃপ্ত হন। শ্রদ্ধায় তাদের মাথা নত হয়ে যায় আবার আবেগ তাদের জাপটে ধরে বঙ্গবন্ধুর মতো। এই ভালোবাসায় তাঁর অনুজরা বাঁচেন, বাঁচে বঙ্গবন্ধুর মধুর স্মৃতি।

তথ্যসূত্র:

রহমান (২০১২), শেখ মুজিবুর, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১২

রহমান (২০১৭), শেখ মুজিবুর , কারাগারের রোজনামচা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ: ভাদ্র ১৪২৪ / আগস্ট ২০১৭

হক (২০১৩), আনিসুল, উষার দুয়ারে, প্রথম প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

রহমান (২০১৬), মেজর জেনারেল এম খলিলুর, কাছ থেকে দেখা ১৯৭৩-১৯৭৫, প্রথম প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৬ ■

সবাই কাঁদছে

মুস্তাফা মাসুদ

বিলের নাম জলেশ্বর। বর্ষায় থই থই পানি। অন্য সময় প্রায় শুকনোই থাকে। এই বিলের সাথে যাদের নাড়ির বন্ধন সেই চাষিরা, বিশেষ করে তরুণ চাষিরা মাঠের মধ্যে গড়ে তুলেছে একটা ক্লাব– জলেশ্বরের রাখাল ক্লাব। ক্লান্তশ্রান্ত চাষিদের সাময়িক বিশ্রাম আর পানি পানের জন্যই ক্লাবটি গড়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ওরা এখানে লুডুও খেলে। কাছের গ্রামের শিশু-কিশোর এবং তরুণ-তরুণীরাও বিকেলে এখানে আসে আশপাশে ঘুরতে, সময় কাটাতে। এখান থেকে জলেশ্বরের দিগন্তে অস্তায়মান সূর্যের বর্ণিল আভা দেখতে পাওয়া বাড়তি আনন্দের। সব মিলিয়ে জলেশ্বরের রাখাল ক্লাব মাঠের মধ্যে দারুণ এক বিনোদন কেন্দ্র হয়ে উঠছে দিনে দিনে। এরই মধ্যে ক্লাবটি কিছু কিছু সৃজনশীল কাজেও জড়িত হয়ে পড়েছে কয়েক বছর থেকে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেছে মাঝে মাঝে। যেমন: গত বছর একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস, ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

এ বছর শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাখাল ক্লাব। তার পরই তো মার্চের প্রথম দিকে দেশে করোনা সংক্রমণ শুরু হলো এবং মানুষের মৃত্যুও হতে লাগল, যা এখনো শেষ হয়নি। কবে এ বিপদ শেষ হবে তারও ঠিক নেই। এ কারণে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের পর আর কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। এখন জাতীয় শোক দিবসের স্মৃতিকাতর আগস্ট মাস; অথচ রাখাল ক্লাব কোনো

অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারছে না, এ বেদনা আমাদের কাছে দুঃসহ। তাই গত বছরের অসাধারণ ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠানের গল্প বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাই; যাতে আমরা এ বছরের অনুষ্ঠান করতে না পারার দুঃখ-অতৃপ্তি কিছুটা হলেও ভুলতে পারি। তাহলে এসো বন্ধুরা, ফ্লাশব্যাক টু গত বছরের জাতীয় শোক দিবস পনেরোই আগস্টে!

আজ পনেরোই আগস্ট, ২০১৯। শোকাবহ ৪৫তম জাতীয় শোক দিবস। একটু পরেই জলেশ্বরের রাখাল ক্লাবের অনুষ্ঠান শুরু হবে। ক্লাব ঘিরে কালো কাপড়ের শোক চিহ্ন। লাল ও কালো কাপড়ের ছাউনির একটি প্যান্ডেল, একটি মঞ্চ। মঞ্চে দুটি লম্বা টেবিল, আটটি কাঠের চেয়ার; প্যান্ডেলের নিচে প্লাস্টিকের চেয়ার দেওয়া হয়েছে শ'দুয়েক– বাকি জায়গায় পাটি বিছিয়ে দেওয়া। রাখাল ক্লাবের সব চাষি-সদস্য এবং স্থানীয় প্রাইমারি ও হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাবের সামনের লম্বা ভূখণ্ডের (ভাঙাড়ের বা বাচ্ড়ার) উপরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। সবার গলায় বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যাজ ফিতে দিয়ে ঝুলানো, জামায় কালো ব্যাজ আর মাথায় কালো রঙের ক্যাপ। ভাঙাড়ের দুপাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে একদল বাদক– তারা মৃদু শব্দে ড্রামে করুণ বিষণ্ন সুর বাজিয়ে যাচ্ছে। আছে মাইকও।

সকাল সাতটা এক মিনিট। আমার ছোটো দাদা বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান রাখাল ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। এ সময় সবার মুখে জাতীয় সংগীত– 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি...' জাতীয় সংগীতের সুরে সুরে বিশাল বিল জলেশ্বরের বুকে যেন অপরূপ কাঁপন ওঠে– মনে হয়, সারাটা বিলই সেই সুরে সুর মিলিয়েছে!

জাতীয় সংগীতের পর মঞ্চে আসে ক্লাবের চাষি সদস্য আবুল হোসেনের কিশোর ছেলে স্বপন। সে এতদিন মেঠো গায়ক হিসেবেই পরিচিত ছিল, এবার দ্বিতীয়বারের মতো মঞ্চে উঠল– প্রথমবার উঠেছিল গত বছর, জাতীয় শিশু দিবসে স্কুলের অনুষ্ঠানে। ছোটো দাদা তার গান শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সেদিনই তিনি স্বপনকে দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে গান করাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন এবং সেই মতো তাকে প্রস্তুতি নিতেও বলেছিলেন। স্বপন এখনো বাদ্যযন্ত্রের সাথে কণ্ঠ মেলাতে পারে না বলে বাদ্যযন্ত্র শিল্পীরা না বাজিয়ে বসে রইল। হঠাৎ স্বপনের উদাত্ত সুরে আমরা চমকে উঠি। কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই, তবুও কী চমৎকার সুর-তাল-লয় আর উপস্থাপনা! বয়সের তুলনায় তার কণ্ঠ বেশি ভরাট যেন! অংশুমান রায়ের গাওয়া সেই বিখ্যাত গানটি নিজের কণ্ঠে কী অসাধারণ নির্ভুল দক্ষতায় তুলে নিয়েছে স্বপন! আকাশ–বাতাস তোলপাড় করা সেই বাণী, সেই সুর: 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি'। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ...' গান শেষ হওয়ার পর তুমুল হাততালি এবং আরো গান শুনতে চাওয়ার আবদার। কিন্তু ছোটো দাদার ইঙ্গিতে স্বপন মঞ্চ থেকে নেমে আসে। তারপরও সমবেত সবাই যেন খানিকক্ষণ সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকে স্বপনের দিকে। স্বপন লাজুক চোখে নিচে এলে ছোটো দাদা উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন আর বলেন: শাবাশ দাদুভাই, শাবাশ! রাখাল ক্লাবের মান রেখেছিস তুই!

এবার আরো একটি গান। মাইকে যার নাম ঘোষণা করা হলো, সে রাখাল ক্লাবের তরুণ সদস্য সুজাউদ্দিন। বয়স পনেরো–ষোলো। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। সুজাউদ্দিনের কণ্ঠে শোনা গেল স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত সেই বিখ্যাত গানটি, যে-গান প্রচারিত হয়ে একাত্তরে স্বাধীনতাকামী কোটি মানুষকে প্রেরণা দিত। সাহস দিত। সুজাউদ্দিনের মিষ্টি-ভরাট কণ্ঠে 'মুজিব বাইয়া যাও রে/নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের নাও মুজিব বাইয়া যাও রে...' গানটির সাথে সাথে মঞ্চ, পুরো প্যান্ডেল আর চারপাশের মাঠ প্রকৃতি যেন গমগম করে ওঠে; সবাই যেন সুজাউদ্দিনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছে! গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই করতালিতে ভরে দেয়। তারপর সবাই জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনিতে চারদিক মুখর করে তোলে। মাঠের কিছু স্বাধীন-পাখি এ সময় উড়ে এসে বসে ক্লাবের পশ্চিম পাশ ঘেঁষা ছোট্টো পাকুড় গাছটিতে; তারাও কি জনতার জয়ধ্বনির সাথে গলা মেলাতে এসেছে? কে জানে!

পর পর দুটি গান ছিল মূলত উদ্‌বোধনী সংগীত। এরপর মূল অনুষ্ঠান। মান্যগণ্য অতিথিরা নিচের আসন থেকে মঞ্চে এসে চেয়ারে বসলেন। অন্যরা দর্শক সারির চেয়ারে এবং পাটির উপর। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছোটো দাদা মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান।

মঞ্চে এবার বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ভাষণের পালা। ভাষণ দিলেন স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও চাষি সদস্য শরাফত হোসাইন, স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল ও চাষি সদস্য আজগর আলি, চাষি সদস্য হাবিবুর রহমান, মনু মাস্টার, ইউনুছ আলি, বাবর আলি, রাখাল ক্লাবের সভাপতি আবুল হাশেম, সেক্রেটারি নাদের আলি এবং সদস্য ইমরান হোসেন। ছোটো দাদার বড়ো পুতনির বড়ো মেয়ে লিথিকেও আলোচনায় অংশ নিতে হলো অধ্যক্ষ আজগর আলির বিশেষ অনুরোধে। বক্তারা সবাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অনন্য অবদানের বিষয়ে আলোচনা করলেন। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রসঙ্গ আলোচনার সময় দর্শক সারি থেকে অনেকেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বক্তৃতা পর্বের সবশেষ বক্তা হলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। তার বক্তৃতার পর থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দাদাজান ধীর পায়ে এবং কিছুটা চিন্তিত মনে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকলেন, কিছু বলছেন না; শুধু পুব দিকে তাকাচ্ছেন বার বার। এদিকে দর্শক-শ্রোতারা উৎকণ্ঠিত– দাদাজান অমন করছেন কেন, কিছু বলছেন না কেন! তিনি কী ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন! কিন্তু তাও-বা কী করে হয়? তাকে তো সুস্থই দেখাচ্ছে! তবে তিনি কী কারো জন্য অপেক্ষা করছেন! আরো কেউ কি আসবেন! এমনি জল্পনাকল্পনার মাঝেই দাদাজান হঠাৎ বলেন– আমি সভাপতি হলেও এখনো একজনের বক্তৃতা বাকি আছে; ওই যে তিনি আসছেন! একটু পরেই... বলতে বলতে দাদাজান দ্রুত মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। অতিথিকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন, তারপর সম্মানের সাথে মঞ্চে এনে বসালেন। গভীর আবেগে তিনি বললেন: একটু পরেই বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রিয় 'বঙ্গবন্ধু'; তার আগে তাঁর সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই: আমাদের এই বন্ধু দেখতে অবিকল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মতোই। তাই আমরা– ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাকে ভালোবেসে 'বঙ্গবন্ধু' বলতাম, আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আদর করে তাকে 'মিতা' ডাকতেন। আপনারা সবাই দেখুন 'বঙ্গবন্ধুকে'– কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছেন কী! তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর চেয়ে বয়সে বছর-দশেকের ছোটো– আমার চেয়ে বেশ বড়ো। বঙ্গবন্ধু-অন্তপ্রাণ ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুও তাকে ভারি স্নেহ করতেন। সেই ষাটের দশক থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথি হন এবং আন্দোলন-সংগ্রামে সব সময় তাঁর কাছাকাছি থেকেছেন। তিনি জীবনবাজি রেখে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করেন; যুদ্ধের সময়ই তার সাথে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। বেশ কয়েকবার তার সাথে আমি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে গিয়েছি। বঙ্গবন্ধু তাঁর মতো আমাকেও খুব আদর করতেন। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কালরাত্রির পর এই 'বঙ্গবন্ধু' নিখোঁজ হন। সেই থেকে এতটা বছর তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন। দিন তিনেক আগে সাতক্ষীরা থেকে তাঁর লেখা একটা চিঠি পাই। সাথে সাথে আমি আমার এক বন্ধুর ছেলে নুরুন্নবীকে পাঠাই সাতক্ষীরায়, তাকে নিয়ে আসতে। তিনি অসুস্থ থাকায় একটু দেরি হয়েছে আসতে, নুরুন্নবী মোবাইলে সব জানিয়েছিল আমাকে। এজন্যই তো আমি সভাপতির ভাষণ না দিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করেছি।

এ পর্যন্ত বলে ছোটো দাদা আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে 'বঙ্গবন্ধু'র চেয়ারের কাছে যান এবং তাকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ পর দুজন শান্ত হন এবং পাশাপাশি চেয়ারে বসেন। সবার দৃষ্টি মঞ্চে বসা 'বঙ্গবন্ধু'র দিকে– বঙ্গবন্ধুর মতোই প্রায় ছ'ফুট লম্বা দেহ, সেরকম গোঁফ, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি-মুজিবকোট, হাতে পাইপ ইত্যাদি সব অবিকল একই রকম। তাঁর কণ্ঠস্বরটা কেমন হবে তা বোঝা যাবে একটু পরে– তিনি কথা বললে। সবার মধ্যে টানটান উত্তেজনা– কী বলবেন তিনি, কেমন করে ও কেমন ভঙ্গিতে বলবেন– তা কী আসল বঙ্গবন্ধুর মতো হবে!

একটু পর ছোটো দাদা সবার উৎকণ্ঠা দূর করলেন,

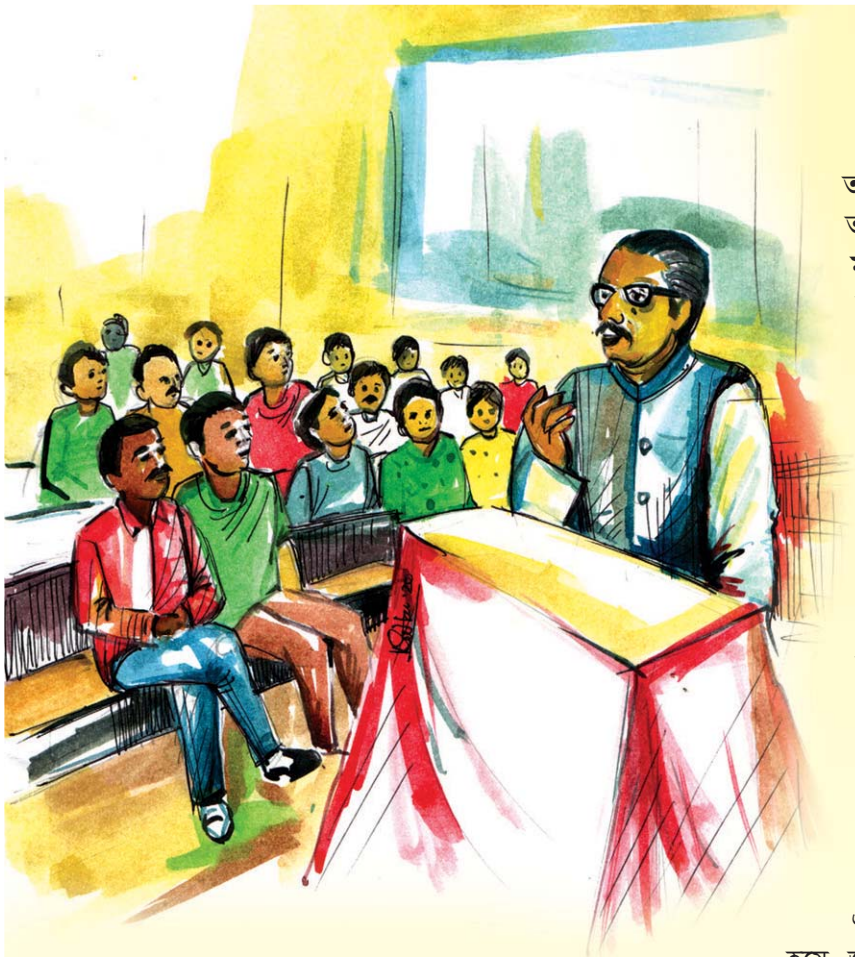

বললেন: এখন আপনাদের সামনে দু-একটি কথা বলবেন আমাদের 'বঙ্গবন্ধু'।

নব্বইয়ের কাছাকাছি বয়স, নাকি একশ? এই 'বঙ্গবন্ধু'র বয়স একটু বেশি মনে হচ্ছে কেন– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মতো! অথচ কী অবিশ্বাস্য দৃঢ়পায়ে হেঁটে তিনি মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন! সমবেত শ্রোতা-দর্শকদের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে তিনি গভীর আবেগে, ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন: ভায়েরা আমার! আমি তোমাদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়তে বলেছিলাম, তোমরা গড়েছিলে; আমি তোমাদের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলাম, তোমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছো। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে। কিন্তু দেশি-বিদেশি নষ্টচক্রের কারসাজিতে তোমাদেরকে আমি সোনার বাংলা উপহার দিয়ে যেতে পারিনি! সেজন্য আমার যে কী কষ্ট! কী কষ্ট! তবে তোমাদের এই রাখাল ক্লাবে এসে আমি খুব খুশি হয়েছি। কৃষক সমাজের এই একতা, তার সাথে শিক্ষিত তরুণ-যুবকদের এই যে সহযোগিতা, তা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমার সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল, আমি তা শেষ করে যেতে পারিনি। আমার মেয়ে হাসু– আহা রে, সেই ছোট্টো হাসুটা এখন কত বড়ো হয়েছে! সে আমারই পথ ধরে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা সবাই তাকে সহযোগিতা করবে।... ভাই আতিক, আমি আর থাকতে পারছি না, সময় কম। খোদা হাফেজ! জয় বাংলা!– বলতে বলতে তিনি দ্রুত মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নেমে জোরে হাঁটা শুরু করেন পশ্চিম দিকে, যেদিকে জলেশ্বরের পশ্চিম প্রান্ত দিগন্তের সাথে মিশেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে আর কোথাও দেখা গেল না!

এতক্ষণ সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে জড়বস্তুর মতো বসে ছিলেন। মুগ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর কথা শুনছিলেন– সেই বজ্রকণ্ঠ, সেই জাদুমাখা আকর্ষণ! সমুদ্র-কল্লোলের মতো সেই সাহস জাগানো আলোড়ন! তিনি কখন বক্তৃতা শেষ করেছেন, কখন মঞ্চ থেকে নেমে গেছেন, তা কেউ লক্ষ্য করার অবকাশই যেন পাননি, এমনকি দাদাজানও না। ঝাড়া দশ মিনিট পর সবাই সম্বিত ফিরে পান, নড়েচড়ে বসেন। মঞ্চ এবং প্যান্ডেলের মধ্যে চাপা উত্তেজনা আর সমবেত গুঞ্জন: বঙ্গবন্ধু! বঙ্গবন্ধু কই! তিনি কোথায় গেলেন! কোথায়... হায় হায়! আমরা তাকে কাছে পেয়েও ধরে রাখতে পারলাম না!

একটু পরে সেই গুঞ্জন চাপা বিলাপে পরিণত হলো। আস্তে আস্তে চাপা বিলাপ হাউমাউ কান্নায় রূপান্তরিত হয়। বিল জলেশ্বরের সব স্বাধীন-পাখি সেই কান্নার শব্দে উড়ে এসে বসে মঞ্চের লম্বা টেবিলের উপর, মঞ্চের সামনে, প্যান্ডেলের উপরে এবং দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে। সবাই কাঁদছে... বঙ্গবন্ধুর জন্য কাঁদছে। ■

মুজিব

মানতাকা তাবাস্‌সুম গুড়িয়া

এক যে ছিল মুজিব
নাম ছিল তাঁর খোকা,
সে যে ছিল বঙ্গবন্ধু
সব মানুষের নেতা।
হানাদারদের ডিঙিয়ে সে
স্বাধীন করল দেশ,
তাঁর কথা যে ভুলবে না কেউ
এ দেশেরই বেশ।
সে যে ছিল অসীম সাহসী
ছিল না কোনো ডর,
তাঁর জন্য স্বাধীন পতাকা
উড়ছে যে ফড়ফড়।

সপ্তম শ্রেণি, চিলাহাটি মার্চেন্টস হাই স্কুল, ডোমার, নীলফামারী

বঙ্গবন্ধু তুমি

প্রজীৎ ঘোষ

এই বাঙালির জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু তুমি;
মা তোমাকে জন্ম দিয়ে
পূণ্য করেছে ভূমি।
মার্চে তোমার সফল গাথা
ইতিহাসের সাক্ষী;
তোমার ডাকে সাড়া দেয় ওই
স্বপ্নের ময়ূরাক্ষী।
৭ই মার্চের ভাষণ শুনে
সবাই ওঠে জেগে;
স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে
আনন্দ আবেগে।
নৌকার ওই হালটা যদি
না ধরতে হায় তুমি!
বাংলা সেদিন হতো ঠিকই
নিঃস্ব মরুভূমি।
বাংলা মায়ের বুকে লেখা
থাকবে তোমার নাম;
ভালোবেসে আমরা দেবো
তোমার স্নেহের দাম।
বঙ্গবন্ধু সুখে থাকো
শুভ জন্মদিন;
তোমার কাছে বাংলা মায়ের
শোধ হবে না ঋণ।

স্বজনহারা শোক

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
কাঁদছে বনফুল
মর্ত্যভূমির গাছ-গাছালি
আর যে নদীর কূল।
দোয়েল কাঁদে কোয়েল কাঁদে
শাপলা কাঁদে একা
অশ্রু ঝরায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে
সাগর-নদীর রেখা।
পাহাড় কাঁদে শ্রাবণ কাঁদে
স্বজন হারা শোক
হৃদয় মাঝে তোমার ছবি
কাঁদছে দেশের লোক।
আগস্ট এলে সবাই কাঁদি
বুকের মাঝে সাহস বাঁধি।

তোমার মতো একটা মুজিব

মুহাম্মদ ইসমাঈল

মুজিব নামে একটি খোকা টুঙ্গিপাড়া গ্রাম
রয়েছে গাছের সারি সারি আম, লিচু, জাম
গাছে গাছে ফুল-ফল মৃদু সমীরণ
ছায়া এত মায়া দেয় অনুপম ক্ষণ।
বীর জনতার বীর নেতা তুমি
বীর বাঙালির গৌরব
হাজার সালাম জানাই তোমায়
হাজার ফুলেল সৌরভ
নেতা তুমি অনেক বড়ো
ভাষণ ছিল কড়া
সারা দেশের মানুষ তখন
দিলো তোমায় সাড়া।
তোমার মতো একটা মুজিব
থাকতো যদি কেউ
থাকতো না আর দেশের মাঝে
দুঃখ নদীর ঢেউ।

প্রিয় বঙ্গবন্ধু

মো. সাজ্জাদ আলম

বঙ্গবন্ধু নামে তাঁকে
চিনে সকলে
তাঁর অমর কীর্তির কথা
সারা দুনিয়ার সবাই বলে।

তিনি ছিলেন সবার কাছে
মাটিও মানুষের নেতা
তাঁর নেতৃত্বে পেয়েছি
আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা

সপ্তম শ্রেণি, রেলওয়ে স্কুল, চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধু

তানজিবা হোসেন

সারা দুনিয়া জুড়ে
সবার কাছে প্রিয় একটি নাম
তিনি হলেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর নেতৃত্বে আমরা
পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা
তিনিই বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
আমাদের মহান নেতা।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার

শোকাহত আগস্ট

বেণীমাধব সরকার

এ দেশের বুকে আগস্ট আসে শোকের আগুন জ্বেলে,
বুকের গভীরে আহত পরান দীর্ঘশ্বাস ফেলে ।
পথহারা জাতি যার নির্দেশে পেয়েছে পথের দিশা
যার কর্মের গুণেতে কাটল ঘোর আন্ধার নিশা ।
জেল জুলুমের বন্ধুর পথে হেঁটে সে দিবস রাতি
আমাদের তরে আয়োজন করে আঁধারে আলোক বাতি।
স্বাধীনতা নামে সোনার হরিণ ধরে দিলো অবশেষে,
লাল সবুজের মুক্ত নিশান উড়াল বাংলাদেশে ।
নিশাচর কোন খুন পিয়াসীরা দানবীয় উল্লাসে
তারই বক্ষেতে হানলো কৃপাণ আগস্টের এই মাসে।
সবুজ শ্যামল বাংলার বুক বুকের রক্তে তার
অন্যায় ভাবে বন্যার মতো হয়ে গেল একাকার ।
ছোট্টো রাসেল মা...মা... বলে কেঁদে ওঠেছিল রাতে,
সেই কান্নাও থেমে গিয়েছিল বুলেটের অভিঘাতে।
আমাদের সেই প্রাণ প্রিয় জনে হারিয়েছি এই মাসে,
তাইতো আগস্ট এলেই হৃদয় শোকের সাগরে ভাসে।

বঙ্গবন্ধু

আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই আমরা
পেয়েছি এমন দেশ
তিনিই দিলেন এদেশের নাম
লাল-সবুজের বাংলাদেশ।
অমর হয়ে বেঁচে আছেন
আমাদের সকলের মাঝে
যতদিন বাংলা ও বাঙালি
এ পৃথিবীতে রবে।

সপ্তম শ্রেণি, সৃষ্টি ক্যাডেট স্কুল, টাঙ্গাইল

জয় বঙ্গবন্ধু

রফিকুর রশীদ

আমাদের বাংলার ক্লাস নেন অজিত স্যার। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সবার প্রিয় শিক্ষক। খুব ভালো মানুষ। 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বানান ঠিকমতো করতে না পারলে স্যার রাগ করেন। বানান শেখানো তাঁর প্রিয় শখ, প্রিয় নেশা। ছাত্রদের শুধু নয়, সুযোগ পেলে তাঁর সহকর্মীদেরও বানান শুধরে দেন, বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম-কানুন শেখাতে চান; আড়ালে তাঁরা হাসাহাসি করেন। এমনকি এই বানান-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো এক স্যার নাকি অজিত স্যারের নাম দিয়েছেন 'গন্ধপাধ্যায়', সে-কথা আমাদের কানেও এসেছে, প্রাথমিক হাসাহাসিও করেছি আমরা; কিন্তু স্যারকে আমাদের যে ভালো লাগে সেই ভালোলাগা একটুও কমেনি। অজিত স্যার ক্লাসে ঢুকলেই আমরা আনন্দে হই হই করে উঠি। স্যার মোটেই বিরক্ত হন না, কাউকে ধমক দেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব ছাত্রের চোখে একবার চোখ বুলিয়ে নেন; তাতেই কাজ হয়। সব কোলাহল থেমে যায়। এরপর কথা বলতে শুরু করেন স্যার। কত রাজ্যের কথা যে তিনি বলেন, কথা কিছুতেই ফুরোয় না।

সেদিন ১৬ই মার্চ, ক্লাসে ঢুকেই স্যার প্রশ্ন করেন–

বেরিবেরি কী বলতে পারো?

কারো নাম ধরে বলেননি স্যার, আমরা কেউ কেউ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, এরই মধ্যে এমপি সোহেল উঠে দাঁড়ায়, হাসি-হাসি মুখে জানায়–

ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট স্যার, মানে ভিভিআইপি।

সারা ক্লাস হেসে ওঠে হো হো করে উত্তর শুনে। অথচ স্যার এগিয়ে এসে ঠিকই সোহেলের কাঁধে হাত রেখে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন–

ভেরি ভেরি গুড।

এমপি সোহেলের আসল নাম সোহেল আমিন। আগের টার্মে ওর বাবা ছিলেন সরকারি দলের এমপি। এবারের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু তার ছেলে সেটা মানতেই পারে না। সব সময় মুডে থাকে। খুব ডাঁট তার। সেই জন্যে বন্ধুরা আড়ালে-আবডালে তাকে এমপি সোহেল বলে। না বলে কী করব! আমাদের ক্লাসে যে আরো একটা সোহেল আছে। তার পুরো নাম সোহেল রানা। নামের মিল থাকা সত্ত্বেও সে কিছুতেই এমপি সোহেলের কাছে ভিড়তে চায় না। অথচ সেই সোহেল রানা এত হাসাহাসির মধ্যেও শান্ত কণ্ঠে জানায়–

'বেরিবেরি এক প্রকার অসুখ।' এটুকু বলার পর থামলেই চলত। কিন্তু সে আরো একটু যোগ করে, 'ছোটোবেলায় বঙ্গবন্ধুর এই অসুখ হয়েছিল।'

স্যার বিস্ময়ে চোখ গোল করে বলেন–

এটাও জানো তুমি! তাহলে তো তোমাকেই 'ভেরি গুড' জানাতে হচ্ছে।

শুধু সোহেল রানা নয়, স্যারের এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের অনেকেরই জানা। জাতির জনকের জন্মদিন

উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুবাদে অনেক তথ্যই আমরা জেনেছি। কিন্তু শুরুতেই আমাদের এমপি সোহেল 'ব'-কে 'ভ' শুনে পরিবেশটা এমন গোলমেলে করে তুলবে সে কথা কে জানত! আমাদের ক্লাস-টিচার অজিত স্যারের অসীম ধৈর্য। 'ভেরি গুড' বলে ক্লাসের পরিবেশ ঠিকই ম্যানেজ করে নেন। তারপর হাসাহাসির কোনো সুযোগ না দিয়ে পরবর্তী প্রশ্ন ছুড়ে দেন–

বঙ্গবন্ধু প্রথমে কোন ইশকুলে লেখাপড়া শুরু করেন, জানো তোমরা?

সেকেন্ড বেঞ্চ থেকে রতন লাফিয়ে উঠে জানায়–

গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্যার।

উত্তর সঠিক হওয়ায় স্যার খুব খুশি। একটুও দেরি না করে আবারও জিজ্ঞেস করেন, তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক ইশকুলে ভর্তি হন কোন ক্লাসে?

রতন আবার উত্তর দিতে গেলে স্যার তাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে কামালের সামনে গিয়ে বলেন–

বঙ্গবন্ধুর ছেলের নামে তোমার নাম, তোমাকেই বলতে হবে–

কোন ক্লাসে?

ক্লাস থ্রিতে–কামাল জানায়। কিন্তু জাকির প্রতিবাদ করে। তার মতে বঙ্গবন্ধু তখন ক্লাস ফোরের ছাত্র। গিমাডাঙ্গাতেই পড়েছেন থ্রি পর্যন্ত। তার বলার ভঙ্গি দেখে স্যার বলেন–

তুমি যে এত জোর দিয়ে বলছ, কোথায় পেলে এই তথ্য?

জাকিরদের বাড়িতে অনেক বই। আমরা জানি ওর বাবা অধ্যাপক মানুষ, তাঁর হাতে বই থাকে সবসময়। নিজে পড়েন, ভালো বই অন্যকেও পড়তে দেন। জাকিরও তাই অবলীলায় বলে–

বঙ্গবন্ধু নিজে বলেছেন স্যার।

তাই নাকি! তুমি জানলে কোথায়?

অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ে।

বাব্বা! এ বইও পড়া সারা!

জাকির সত্য স্বীকার করে–

না স্যার, সারা হয়নি। অর্ধেক পড়া হয়েছে। এ বইয়ের প্রথম দিকেই লেখা আছে–তিনি গোপালগঞ্জে ভর্তি হন চতুর্থ শ্রেণিতে।

আমাদের অজিত স্যার আবেগে আপ্লুত হয়ে বিখ্যাত এই বইটি কীভাবে লেখা হয়, কবে, কীভাবে ছাপা হয় সেই সব গল্প বলেন। আমরা অবাক হয়ে শুনি একজন মানুষ জীবনের অর্ধেকটা সময় বিনা বিচারে জেলখানায় বন্দি থেকেছেন, আবার সেই জেলখানায় বসেই নিজের জীবনের টুকিটাকি সব ঘটনা সাজিয়ে লিখেছেন। লেখা তার সমাপ্ত হয়নি। তাই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। স্যার খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বইটি আমাদের সবারই পড়া উচিত। জানার জন্যেই পড়া উচিত। আর আমাদের ইশকুলে আগামীকাল আছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানান ঘটনা নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা জ্ঞান-জিজ্ঞাসা। সেই প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্লাস যেন সবচেয়ে ভালো ফলাফল করে, অজিত স্যার সেটাই চান। স্যার আমাদের ক্লাস টিচার যে! আমাদের নিয়ে অনেক আশা-ভরসাও তাঁর মনে। সেই জন্যে তিনি আগের দিন এভাবে নানান প্রশ্নের টিপস ধরিয়ে দেন। স্যার আবার প্রশ্ন করেন–

বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশনারি ইশকুলের ছাত্র হন কত সালে?

আমার পাশ থেকে সজীব উঠে দাঁড়ায়–

আমি বলব স্যার?

বল দেখি।

১৯৩৭ সালে।

বাহ্! সাল মনে রাখাই তো কঠিন কাজ। সেটাই তুমি করেছ। তাঁর প্রিয় একজন গৃহশিক্ষকের নাম বলতে পারো?

সজীব তখনো দাঁড়িয়ে। সে-ই উত্তর দেয়–

আব্দুল হামিদ মাস্টার।

স্যার এবার সজীবের পিঠ চাপড়ে বসিয়ে দেন। তারপর সারা ক্লাসে একবার চোখ বুলিয়ে অংকনের

কাছে এসে জানতে চায়–

তুমি চশমা পরছ কত দিন থেকে?

অংকন পুরু লেন্সের কাচের ওপার থেকে ভয়ে ভয়ে তাকায় স্যারের মুখের দিকে। বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরের জীবন থেকে স্যার হঠাৎ এভাবে সরে আসবেন, এটা যেন সে ভাবতেই পারেনি। থতমত খেয়ে সে কোনোরকমে বলে–

আমার চাশমা স্যার?

স্যার অভয় দেন–

হ্যাঁ, তোমারটাই আগে বলো শুনি। কবে থেকে পরছ চশমা?

দু'বছর হচ্ছে। গত বছরের...

স্যার তাকে থামিয়ে দিয়ে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করেন–

বঙ্গবন্ধু চশমা পরতেন কত সাল থেকে জানো?

অংকন অতি সহজে ঘাড় দুলিয়ে জানায়। এ উত্তর তার জানা নেই। জাকির তখন উঠে দাঁড়ায়। হাত কচলে সে বলে–

ওই যে বেরিবেরি অসুখের কথা বললেন না স্যার, ওই অসুখের পর থেকেই বঙ্গবন্ধু চশমা পরেন।

অজিত স্যার হেসে ওঠেন। আবারও ভেরি গুড বলেন। তারপর জাকিরের চোখে চোখ রেখে বলেন–

উত্তর খুব কাছাকাছি হয়েছে। কিন্তু এভাবে কুইজের উত্তর দিলে চলবে?

সারা ক্লাস নীরব। সঠিক সাল-তারিখ আমাদের কারো জানা নেই। শেষ পর্যন্ত স্যারই জানিয়ে দেন–সালটা ছিল ১৯৩৬, অসমাপ্ত আত্ম-জীবনীতেই লেখা আছে। শুধু এইটুকু তথ্য জানিয়ে তাঁর তৃপ্তি হয় না। এরপর তিনি বঙ্গবন্ধুর চশমা কেন যে সাধারণ চশমা ছিল না, সেই ব্যাখ্যা শোনান। কালো রঙের চওড়া ফ্রেমের চশমা। আরো অনেকেই এ রকম চশমা পরে। সবাই চশমা পরে বর্তমানের দৃশ্য স্বচ্ছভাবে দেখার জন্যে। আর বঙ্গবন্ধু চশমা চোখে দিয়ে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখতে পেতেন। ভবিষ্যতে বাঙালি জাতি যে স্বাধীন হবেই, এ দৃশ্য তিনি অনেক আগেই দেখতে পেয়েছেন।

আমরা মুগ্ধ হয়ে স্যারের কথা শুনছি। এরই মধ্যে এমপি সোহেল হঠাৎ বেমক্কা প্রশ্ন করে বসে–

শেখ মুজিবের চশমা কি তাহলে জাদুর চশমা ছিল?

প্রশ্ন শুনে স্যার দু'মিনিট চুপ করে তাকিয়ে থাকেন। তারপর সোহেলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন–

'জাদুর চশমা'–বেশ বলেছ যা হোক। বঙ্গবন্ধু এই জাদুকরি ক্ষমতা কোথায় পেয়েছিলেন বলতে পারো তোমরা?

খুলনায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৫৬

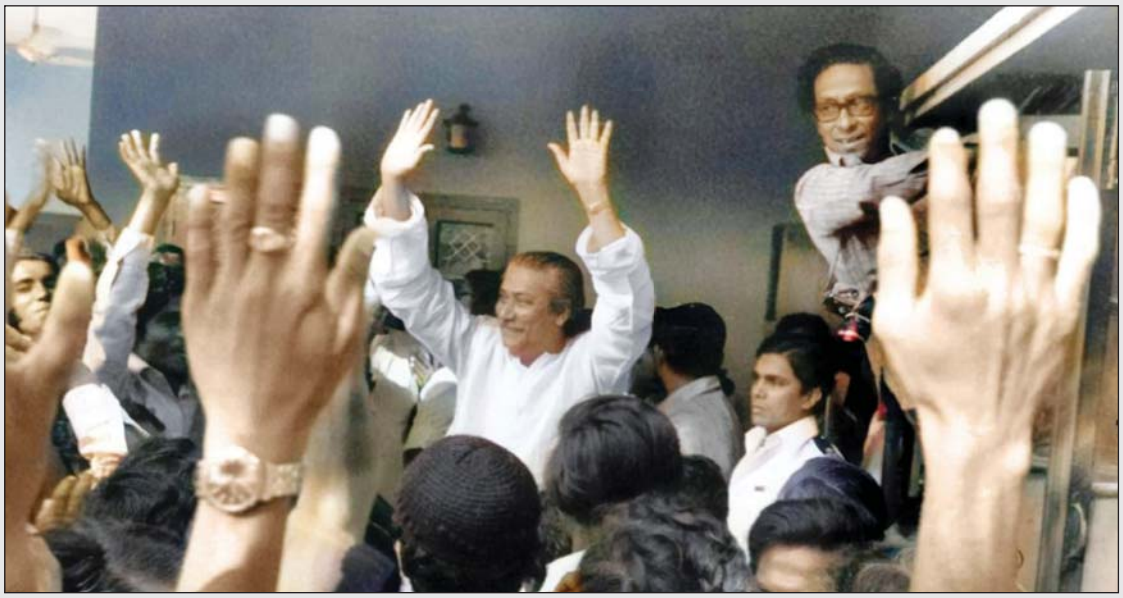

আমরা সবাই চুপ। একটু থেমে স্যার নিজে থেকেই ব্যাখ্যা দেন–

বাংলার মানুষকে ভালোবেসে।

নিজের চোখের চশমা খুলে পাঞ্জাবির কোনায় কাচ মোছেন স্যার। আবার সেই চশমা নাকের ডগায় চাপিয়ে তিনি আবেগমাখা কণ্ঠে বলেন–

বাংলার মানুষের ভালোবাসায় জাদু আছে। সেই জাদু শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু করেছে, জাতির জনক করেছে।

এই পর্যন্ত বলার পর অজিত স্যার নিজের আবেগ সংবরণ করেন এবং হঠাৎ করেই আগের মুডে ফিরে যান। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে পরিমলকে জিজ্ঞাসা করেন, কবে থেকে তাঁকে বঙ্গবন্ধু বলা হয় বলো দেখি?

পরিমল নিরুত্তর। স্যার যেন কিছুটা হতাশ হন। বিভিন্ন সারির ছাত্রদের সামনে দিয়ে হেঁটে যান। চোখে চোখে তাকান। হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েন মুজিবুলের সামনে এসে। নাম মুজিবুল কবীর। স্যার তাকে বলেন–

এই যে শেখ সাহেব, তোমাকে বলতেই হবে শেখ মুজিব কবে বঙ্গবন্ধু হলেন?

বেশি ভাবনা-চিন্তা না করে মুজিবুল ঝটপট উত্তর দেয়–

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি।

স্যার প্রতিবাদ করেন–

না না, উত্তর সঠিক হয়নি।

বইয়ে পড়লাম যে স্যার! মুজিবুল তর্ক করে। স্যার মনে করিয়ে দেন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির পর ওই দিন বঙ্গবন্ধু স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসেন। ওটাও খুব ঐতিহাসিক দিন। উত্তর সঠিক না হলে কুইজে বিজয়ী হওয়া যায়? বলো, বঙ্গবন্ধু কবে বঙ্গবন্ধু হলেন?

আমাদের মুখে কথা নেই। ভাবনা হয়, আগামীকাল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কুইজ প্রতিযোগিতায় সত্যি আমরা বিজয়ী হতে পারব না। স্যার আবারও বলেন–

আমি সহযোগিতা করছি। সেটা ছিল স্বাধীনতার আগের ঘটনা। এখন বলো সালটা ছিল কত?

নাহ্, এ সহযোগিতা বিশেষ কাজে লাগে না আমাদের। আমরা সেই সালটা কেউ খুঁজে পাই না। সবাই বঙ্গবন্ধু বলছি মুখে, অথচ 'বঙ্গবন্ধু' এল কোত্থেকে, কীভাবে সেটা জানব না! স্যার দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন; আমরা কিছুই বলতে পারছি না, কী যে লজ্জা! অবশেষে আমাদের লজ্জা ঢেকে দেবার জন্যে লাস্ট বেঞ্চ থেকে সাইফুল উঠে দাঁড়ায় এবং দুম করে ঘোষণা করে, সেটা ছিল ১৯৬৯ সাল।

আমরা তো ভীষণ অবাক। সাইফুল বাপের টাকায় বন্ধুদের নাশতা খাওয়ায়, দশ-বিশ টাকা ধার দিয়ে উপকার করে, এককথায় তাকে ভালো মানুষ বলা চলে; তাই বলে ভালো ছাত্র তো কেউ বলবে না তাকে!

সেই সাইফুল সঠিক উত্তর দিলে স্যার খুশিতে তাকে জাপটে ধরেন এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে ঐতিহাসিক উনসত্তরের ব্যাখ্যা দেন, সে এক উজ্জ্বল সময় ছিল; দেশের মানুষের সে কী একতা! রাস্তায় নেমে টগবগ করে ফুটছে, হাত তুলে সাহসী স্লোগান দিচ্ছে–জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।

শেখ মুজবি কি তখন জেলখানায়? সোহেল রানা এতক্ষণে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে। স্যার অম্লান হেসে জানান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি করেছে পাকিস্তান সরকার। জেলখানার মধ্যেই গোপন বিচার করে তারা ফাঁসি দিতে চায়। কিন্তু তাই পারে? ওই যে বললাম না, বাঙালির ভালোবাসায় জাদু আছে। সেই জাদুর বলেই বাঙালি জেলখানা থেকে মুক্ত করে এনেছে প্রিয় নেতাকে। রেসকোর্স ময়দানে গণসংবর্ধনা আয়োজন করেছে ২৩শে ফেব্রুয়ারি। সেই সমাবেশে ঘোষণা করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু'।

এত সব ইতিহাসের কথা আমাদের জানা নেই। শুনতে আমাদের ভালোই লাগে। কিন্তু এইখানে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েন অজিত স্যার। আর দেরি না করে তিনি আমাদের ক্লাসের প্রতিযোগীদের নামের লিস্ট ফাইনাল করতে চান। কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে প্রত্যক ক্লাসের তিন সদস্যের একটি টিম। আমাদের টিমে কারা থাকবে সেই নাম ঠিক করবেন ক্লাস টিচার হিসেবে অজিত স্যার। কাগজ-কলম নিয়ে নাম লিখতে গিয়ে স্যার যেন একটু দ্বিধান্বিত হন, চুপচাপ চিন্তা করেন একটুখানি, তারপরই নাম ধরে ডেকে ওঠেন–

সৈয়দ জাকির হোসেন।

ইয়েস স্যার। লাফিয়ে ওঠে জাকির।

রেডি হও। কুইজ কিন্তু শক্ত হবে। এইটুকু বলার পর স্যার কাকে যেন চোখে চোখে খোঁজেন। তারপর দ্বিতীয় নামটি গোষণা করেন, সজীব সৈকত।

স্যারের কণ্ঠে নিজের নামের উচ্চারণ শুনে সজীব আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। খুশি হই আমরাও। কিন্তু তৃতীয় নামটি নিয়ে আমাদের বেশ টেনশন হয়। এবার কার নাম বলবেন স্যার। নামটি কি মনের মধ্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে! তাহলে স্যার একে একে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন কেন! একটা নাম বলে ফেললেই তো হয়। কী আশ্চর্য– এদিকে আমাদের টেনশন বেড়েই চলেছে। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে স্যার এসে দাঁড়ান সাইফুলের কাছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সরাসরি সাইফুলের নাম ঘোষণা না করে তিনি কৌশলে বলেন, এবার কার নাম ডাকা যায় বলো তো সাইফুল?

সাইফুল বলবে নাম! কার নাম বলবে! এ কোন রহস্য স্যারের আমরা বুঝতেই পারি না। এরই মধ্যে এমপি সোহেল উঠে হঠাৎ ঘোষণা করে, আমি কুইজে অংশ নেব স্যার, আমার নামটা দেবেন।

আমরা চমকে উঠি–পাগল নাকি! নিজে মুখে এভাবে নিজের কথা বলা যায়! তাছাড়া সবাই জানে, ওর বাবা করেন বিরোধী রাজনীতি, বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানানোর চর্চাই হয় না ওদের পরিবারে; আগামীকাল কুইজে কী উত্তর দেবে সোহেল! ওর এই সরাসরি দাবির মুখে স্যারও যেন বেশ বিব্রত বোধ করেন। একটু ইতস্তত করে তিনি বলেন, তুমি কুইজে অংশ নিতে চাও ভালো কথা। এ বছরে ভালো করে প্রস্তুতি নাও, আগামী বছরে অংশ নিও।

সোহেল গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, আগামীকাল সে কুইজে অংশ নেবে। তার নামটা দিতেই হবে। স্যারের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। অবশেষে তিনি আবার একটা কৌশল খাটান। পকেট থেকে একটা কয়েন বের করে বলেন, এসো ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যাক। টসে জিতলে তুমি কুইজ টিমে যাবে। বলো, কয়েনের কোন দিকটা তুমি নেবে?

সোহেল এগিয়ে এসে কয়েনটা উলটেপালটে দেখে। একদিকে বঙ্গবন্ধুর ছবি, অন্যদিকে শাপলা ফুল। সোহেল সোজা জানিয়ে দেয়, আমি বঙ্গবন্ধুর দিকটা নিলাম।

আঙুলের ডগায় কয়েন ঘুরিয়ে টস করার বদলে সোহেলের কাঁধে হাত রেখে স্যার বলে ওঠেন, 'জয় বঙ্গবন্ধু।' ■

পারিবারিক কিছু মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু

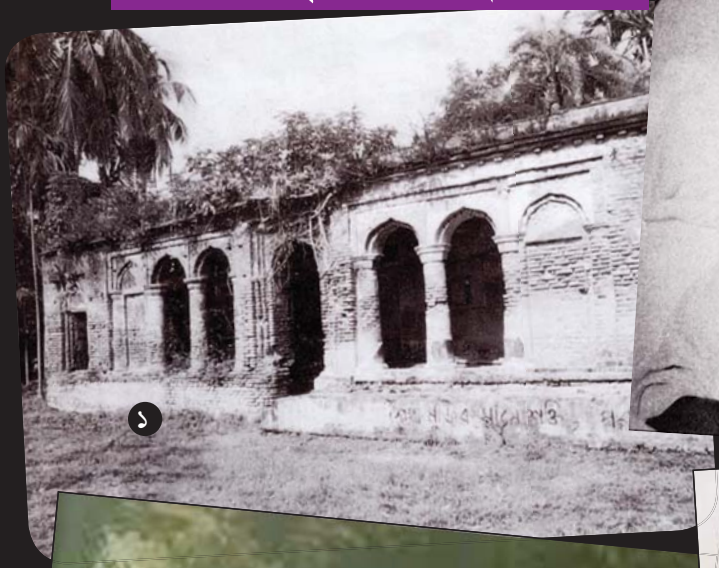

১

২

৩

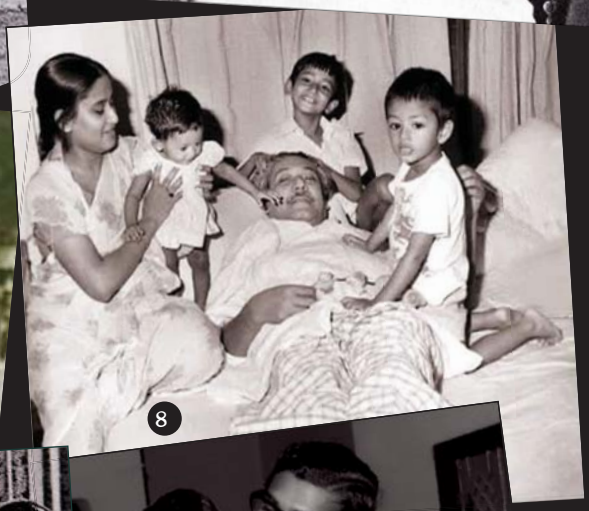

৪

৫

৬

৭

৮

৯

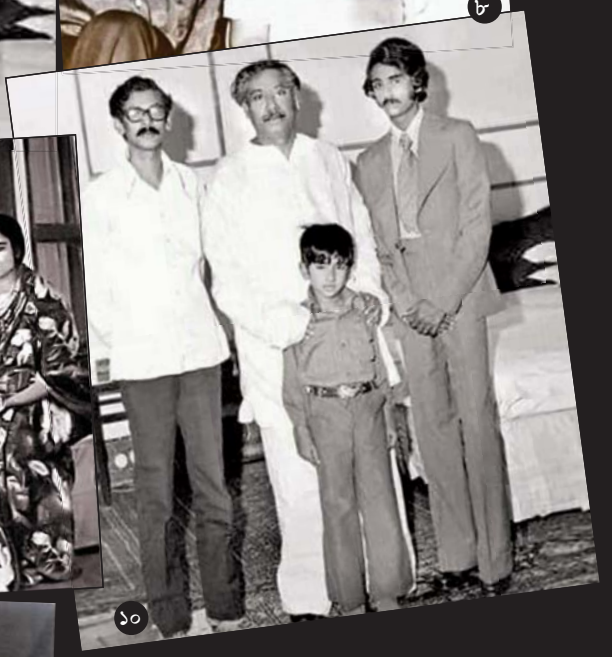

১০

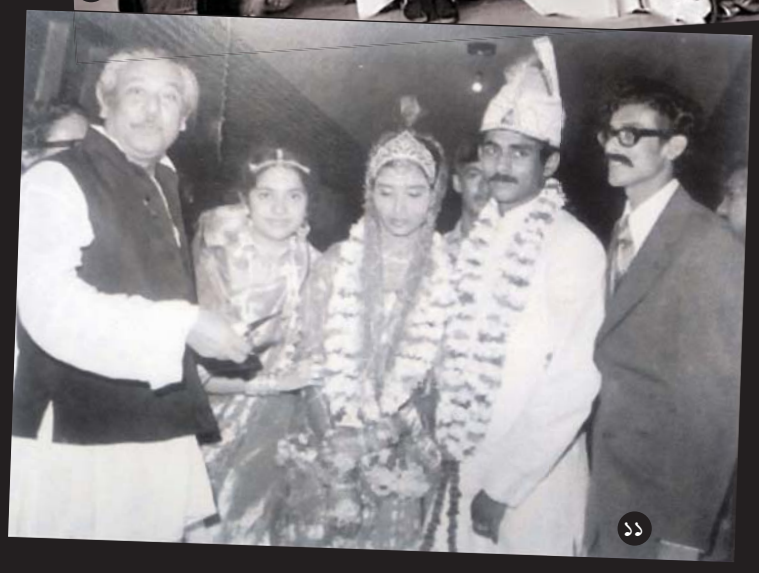

১১

১. বঙ্গবন্ধুর পৈত্রিক বাড়ি, টুঙ্গিপাড়া
২. লন্ডনে চিকিৎসারত বঙ্গবন্ধুর পাশে স্ত্রী
৩. বিবাহ বার্ষিকীতে স্ত্রীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু
৪. বাড়ির শিশুদের সঙ্গে একান্তে বঙ্গবন্ধু
৫. মা-বাবা ও স্ত্রীর সঙ্গে
৬. বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ রাসেল ও সজীব ওয়াজেদ জয়
৭. লন্ডনে শেখ রেহানার সঙ্গে শেখ রাসেল
৮. ভাবিদের সঙ্গে ছোট্ট রাসেল
৯. বঙ্গবন্ধু ও পরিবার
১০. ছেলেদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু
১১. দুই ছেলে ও পুত্রবধূদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর লেখা চিরকুট

আতিক আজিজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে নিজের উষ্ণ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাঁর সমগ্র হৃদয় জুড়েই ছিল বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির ছবি। বাঙালি জাতির জন্য একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাঁর আজীবনের সাধনা বেড়ে উঠেছিল তিল তিল করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, বাঙালির স্বাধীন স্বদেশভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী নেতৃত্বে বেড়ে উঠেছে দিনে দিনে। এর জন্য তাঁকে বছরের পর বছর সহ্য করতে হয়েছে জেল জুলুম আর পরিবার বিচ্ছিন্ন জীবন। তাঁর পরিবারকে সহ্য করতে হয়েছে নির্মম সব বাস্তবতা। অর্থ কষ্টও ছিল চরম। ১৯৫৮ সনে আইয়ুবী মার্শাল ল'র সময় পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে আঁতুরঘরে টুঁটি চেপে ধরে আইয়ুব খান কর্তৃক ফৌজি জমানা প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বন্দি হন সামরিক বাহিনীর হাতে।

বিভিন্ন জেলে অন্তরীণ অন্যান্য রাজনৈতিক সহকর্মীদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু জেলে থেকে যেসব চিরকুট পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন জেল কর্তৃপক্ষ সেগুলো আটক করে। পুলিশ নথি থেকে উদ্ধারকৃত আমাদের একটি চিরকুট ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (হাছু মনি) কাছে লেখা। প্রায় সকল চিরকুটেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, শরীরের যত্ন নেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোর লক্ষ্য করা যায় আর একজন নেতার মানবিক হৃদয়ের পরিচয় ভেসে উঠে আমাদের সামনে।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনামলে সুইডেন প্রবাসী কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর লেখা পত্রটিতে কন্যা শেখ হাসিনা ও তাঁর স্বামী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার শারীরিক সুস্থতা, যত্ন ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। স্বল্প আয়তনের এই চিঠিতে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও অধ্যাপক আব্দুল হাইয়ের মৃত্যু পরবর্তী শোকসন্তপ্ত একটি হৃদয়ের রক্তক্ষরণ লক্ষ করা যায় বিশেষভাবে। যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক গন্ডি ছাপিয়ে গোটা মানবতার জন্য দরদি একটি হৃদয় যেন উপস্থিত হয়েছে আমাদের সামনে। জননেত্রী শেখ হাসিনার (হাছু মনি) কাছে ১৯৬৯ সনের ১৩ই জুন বঙ্গবন্ধুর লেখা চিঠিটির বিবরণী : ■

১৩-৬-৬৯

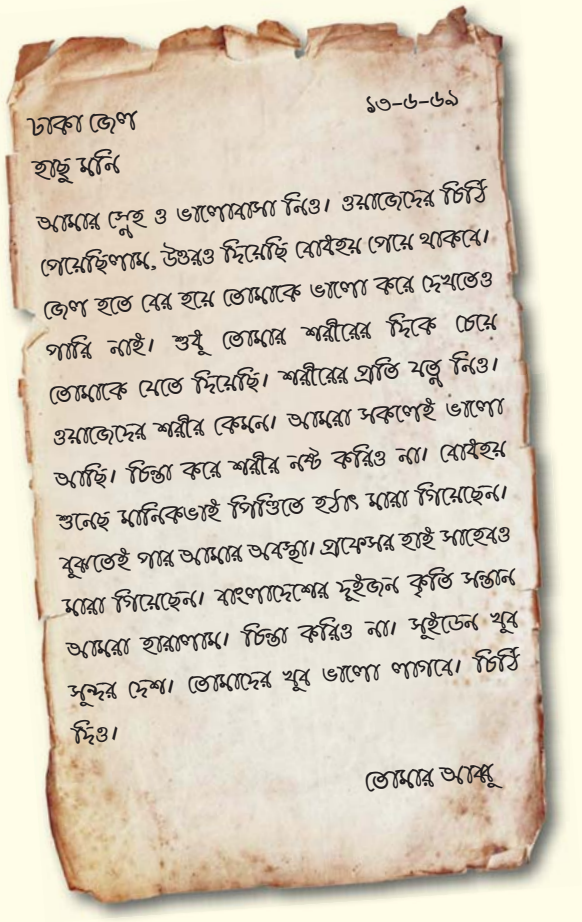

ঢাকা জেল

হাছু মনি

আমার স্নেহ ও ভালোবাসা নিও। ওয়াজেদের চিঠি পেয়েছিলাম, উত্তরও দিয়েছি বোধহয় পেয়ে থাকবে। জেল হতে বের হয়ে তোমাকে ভালো করে দেখতেও পারি নাই। শুধু তোমার শরীরের দিকে চেয়ে তোমাকে যেতে দিয়েছি। শরীরের প্রতি যত্ন নিও। ওয়াজেদের শরীর কেমন। আমরা সকলেই ভালো আছি। চিন্তা করে শরীর নষ্ট করিও না। বোধহয় শুনেছ মানিকভাই পিন্ডিতে হঠাৎ মারা গিয়েছেন। বুঝতেই পার আমার অবস্থা। প্রফেসর হাই সাহেবও মারা গিয়েছেন। বাংলাদেশের দুইজন কৃতি সন্তান আমরা হারালাম। চিন্তা করিও না। সুইডেন খুব সুন্দর দেশ। তোমাদের খুব ভালো লাগবে। চিঠি দিও।

তোমার আব্বু

সব শিশু সম-অধিকার নিয়ে বড়ো হোক। সব শিশুর ভবিষ্যৎ হোক নিরাপদ ও সুন্দর। এ রকম চাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ নামের জাতিরাষ্ট্র পথ চলতে শুরু করেছিল।

কবে? জানো নিশ্চয়ই। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরেই। সে-ই যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ নয় মাস মরনপণ যুদ্ধ করলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম বাস্তবে রূপ নিল। এরপর শুরু হয়েছিল বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব শিশুর জীবন নিরাপদে, ভালোবাসায় কাটবে যে দেশে, বাংলাদেশ নামের সেই দেশটির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন আমাদেরকে। দেশটি স্বাধীনতা লাভ করলে বঙ্গবন্ধু শিশুদের সুরক্ষায় দেশটিকে গড়ে তুলতে চাইলেন। তিনি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। যে–কোনো অনুষ্ঠানে শিশুদের কাছে পেলেই তিনি হয়ে যেতেন ওদের বয়সি আরেক শিশু। শিশুদের জন্য তাঁর দুয়ার সব সময়ই খোলা ছিল। তিনি শিশুদের সাথে সময় কাটাতেন। শিশুদের জন্য কাজ করতে চাইতেন। শিশুদের সুরক্ষায় আইন দরকার, তা তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। আর তাই ১৯৭৪ সালের ২২শে জুন তিনি প্রবর্তন করলেন 'জাতীয় শিশু আইন'। শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন তিনি। এর ফলে বাংলাদেশের সব শিশু প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত বিনা খরচে পড়তে পারার সুযোগ লাভ করে।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু জন্ম নিয়েছিলেন বলেই আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। আর তাই ২০২০ সালের ১৭ই মার্চে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে আমরা বলতে চেয়েছিলাম, পিতা! আমরা কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।

মুজিববর্ষে জাতীয় শিশু দিবস

১৭ই মার্চ, জাতির পিতার জন্মদিনের দিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ বছর, অর্থাৎ ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে শুরু করে ২০২১ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত পুরো একটি বছরকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মুজিববর্ষে জাতীয় শিশু দিবসের স্লোগান কী ছিল, তোমরা জানো? 'মুজিববর্ষে সোনার বাংলা/ ছড়ায় নতুন স্বপ্নাবেশ; শিশুর হাসি আনবে বয়ে/ আলোর পরিবেশ।'

মুজিববর্ষে যত আয়োজন

২০১৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দুটি কমিটি গঠন করে।

প্রথম কমিটির নাম- 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'। এই কমিটির সভাপতি হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কমিটিতে আছেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা, বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রীরা, শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকসহ সমাজের বিশিষ্টজন মিলিয়ে মোট ১১৯ জন সদস্য।

দ্বিতীয় কমিটির নাম- 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭৯ জন। কমিটির সভাপতি হচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে গবেষণাকারী হিসেবে খ্যাতিমান তিনি। কমিটির প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সব পরিকল্পনাকে সমন্বয় করছেন ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক মুখ্যসচিব। অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি তিনি। কামাল চৌধুরী নামে কবিতা লেখেন।

২০১৯ সালের ২০শে মার্চ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দুটি কমিটি একসাথে সভা করে। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার জন্য আটটি উপকমিটি গঠন করা হবে। কী কী কাজ করার জন্য উপকমিটিগুলো গঠিত হয়, তা জেনে রাখি চলো–

১. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও আলোচনা সভা আয়োজন করা

২. বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্‌যাপনের কর্মসূচি ঠিক করা ও তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে বিদেশে যোগাযোগের কাজ করা

৩. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা

৪. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে প্রকাশনা ও সাহিত্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তুলে ধরা

৫. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে আন্তর্জাতিক পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও অনুবাদ কাজ করা

৬. বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ক্রীড়া ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের আয়োজন করা;

৭. বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কাজ মিডিয়ায় তুলে ধরা, জনগণের মাঝে প্রচার ও মুজিববর্ষে যা কিছু ঘটছে, তাকে আর্কাইভে রাখার উপযোগী করে ডকুমেন্টেশন করা এবং

৮. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নতুন প্রজন্ম ও দেশি-বিদেশি দর্শকদের কাছে তুলে ধরার জন্য চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করা।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সদস্যগণ ৮৫টি প্রস্তাব পেশ করেন। বিভিন্ন জনের কাছ থেকেও লিখিতভাবে অনেক প্রস্তাব এসেছিল। আটটি উপকমিটি প্রস্তাবগুলো নিয়ে বার বার আলোচনা করে সব প্রস্তাবকে সমন্বয় করে একটি বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা নিজেরাও অনেক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম মুজিববর্ষকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।

১৭ই মার্চ ২০২০ ছিল মুজিববর্ষের উদ্‌বোধনী দিন। প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়। প্রতি বছর শিশুদের

কলরবে মুখর হয়ে ওঠে বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান ও যেখানে তিনি চির শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন, সেই টুঙ্গিপাড়া। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শিশুদের সাথে সময় কাটাতে টুঙ্গিপাড়া চলে যান। এছাড়াও সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান ও ছবি আঁকার প্রতিযোগিতাসহ নানা আয়োজন থাকে। মুজিববর্ষে জাতির পিতার জন্মদিনে তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশে বিভিন্ন আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, তোমাদের লেখা ও আঁকায় দেয়াল পত্রিকা, স্মরণিকা প্রকাশিত হবে, তোমরা কুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে, কবিতা আবৃত্তি করবে, সবাই মিলে আনন্দ করবে, এ রকম অনেক আয়োজনের কথা ছিল।

করোনা ভাইরাস মহামারি ও মুজিববর্ষের লক্ষ্য

৮ই মার্চ ২০২০ তারিখের খবরে জানা গেল, বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। সারা বিশ্বে এই ভাইরাস অনেক মানুষকে সংক্রমিত করছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। সংক্রমণ ঠেকাতে সবাইকে সাবধান হতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না। প্রয়োজনে ঘরের বাইরে গেলে তিন ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে মুখে মাস্ক পরে অন্যের সাথে কথা বলতে হবে। হাতে গ্লাভস না পরে কোনো কিছু স্পর্শ করা যাবে না। বার বার হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। না ধুয়ে মুখে-নাকে-চোখে হাত স্পর্শ করা যাবে না। ভাইরাস ঠেকাতে প্রচুর ভিটামিন সি খেতে হবে। গায়ে রোদ লাগাতে হবে।

এ রকম সাবধানতা যখন শুরু হয়ে গেল, তখন সবাই মিলে এক জায়গায় জড়ো হওয়ার কোনো ইচ্ছেকে আর কাজে পরিণত করা গেল না। মুজিববর্ষের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান, জাতীয় শিশু দিবসে শিশুদের সম্মেলন, হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীর আয়োজনের অনেক ইচ্ছেকে বাদ দিতে হলো। অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাংলাদেশে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্বের প্রায় সব দেশে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ায় এইসব সফরও বাতিল হলো।

‘মুক্তির মহানায়ক’

খুব মন খারাপ হলো শিশুদের। তবে মূল উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান ‘মুক্তির মহানায়ক’ যখন সারা দেশে ও বিদেশে টেলিভিশন চ্যানেলে, ফেসবুক লাইভসহ সামাজিক মাধ্যমে একযোগে সম্প্রচার করা হলো, তখন সবার সাথে আনন্দে মেতে উঠেছিল শিশুরাও। স্বাস্থ্যবিধি মেনে উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণও করেছিল শিশুরা। একশ শিশুর মিষ্টি কণ্ঠে জাতীয় সংগীত

শুনেছি, শুনেছি আরো একটি সুন্দর গান- 'ধন্য মুজিব ধন্য, বাংলা মায়ের মুক্তি এল এমন ছেলের জন্য।'

শিশুদের চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী

মুজিববর্ষের উদ্‌বোধনী দিনের অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল প্রধানমন্ত্রীর চিঠি। সারা দেশের শিশুদের উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিটি পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শত বিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একযোগে পাঠ করা হয়েছিল। বেতার ও টেলিভিশনে পড়ে শোনানো হয় অসাধারণ সুন্দর সেই চিঠি। কেবল ছোটোরাই নয়, বড়োরাও মন ভরে শুনেছেন, পড়েছেন প্রধানমন্ত্রীর লেখা চিঠিটি। জাতির পিতার জীবন ও সংগ্রামের কথা আছে চিঠিতে। শিশুদের মাঝে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনা জেগে ওঠার কথা বলেছেন তিনি। ২০৪১ সালে যে উন্নত বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাই, তা গড়বে তো আজকের শিশুরাই। তাদেরকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে দায়িত্ববান করে তুলতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা।

করোনা-যুদ্ধ ও মানুষের মানবিকতা

গোটা জাতি করোনা ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করছে। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন গণমানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। ছোটোবেলা থেকেই মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর সেই মানব কল্যাণের ব্রতকে মনের ভেতর গেথে নিয়ে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াল দেশের মানুষ। জাতীয় কল সেন্টার ৩৩৩-এ কল করলেই মিলছে জরুরি ত্রাণসামগ্রী ও স্বাস্থ্যসেবা।

মানুষ কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তার খবর ছড়িয়ে আছে চারপাশে। সরকার এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ছিন্নমূল অভাবী মানুষদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে মাসের পর মাস। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের তাণ্ডবে মানুষ আরো বেশি বিপদে পড়লেও রাষ্ট্র বিপদ ঠেকাতে সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বছরের ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'যতদিন না এই সংকট কাটবে, ততদিন আমি এবং আমার সরকার আপনাদের পাশে থাকব, ইনশা আল্লাহ্।'

আর তাই, কোনো কোনো ভয় ধরানো খবরে যেমন বলা হচ্ছিল, বাংলাদেশে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটবে, ঢাকা শহরেই নাকি লাখো মানুষ মারা যাবে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে। আমেরিকা- ব্রাজিল এবং এ রকম দেশগুলোতে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। সৃষ্টিকর্তার অশেষ করুণায় আমরা এ রকম বিপদে পড়িনি। আমাদের দেশটা অত ধনী নয়। বিপুল জনসংখ্যার দেশে সবাইকে খুব ভালোভাবে সেবা করা হাসপাতালগুলোর জন্য অনেক কঠিন কাজ। এখনো আমাদের অনেক ডাক্তার দরকার। প্রতি দুই হাজার পাঁচশ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিতে পারেন মাত্র একজন ডাক্তার। এরপরও আমাদের ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা অনেক বেশি হারে সুস্থ হয়ে উঠছেন। লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু আমরা দেখতে চাই না। কিছুতেই না।

সীমিত সামর্থ্য নিয়ে 'যার যা কিছু আছে তা নিয়েই যুদ্ধ করা' বাঙালি শিখেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়, সেই ১৯৭১ সালে। বঙ্গবন্ধু এই আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া সেই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি এই কথা বলেছিলেন, তোমরা নিশ্চয়ই তা জানো ও শুনেছ অনেকবার। এই আহবান এই সময়ে এসেও আমাদেরকে প্রেরণা জোগালো। যার যা কিছু আছে, তা নিয়েই যুদ্ধ চলছে। এবারও যুদ্ধে জয়ী হতে চাই আমরা। মুজিববর্ষে বাঙালির পরাজয় ঘটতে পারে না। মুজিবের মানুষকে ভালোবাসার অসীম শক্তি মুজিববর্ষের মূল প্রেরণা হয়ে উঠল।

শিশুদের পাশে বাংলাদেশ

এই সময়ে শত দায়িত্বের মাঝেও রাষ্ট্র ভোলেনি শিশুদের কথা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কেবল মাত্র শিশুদের জন্য দেশের প্রথম করোনা ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। আক্রান্ত কোনো শিশু এলেই এখানে ভর্তি করা হয়।

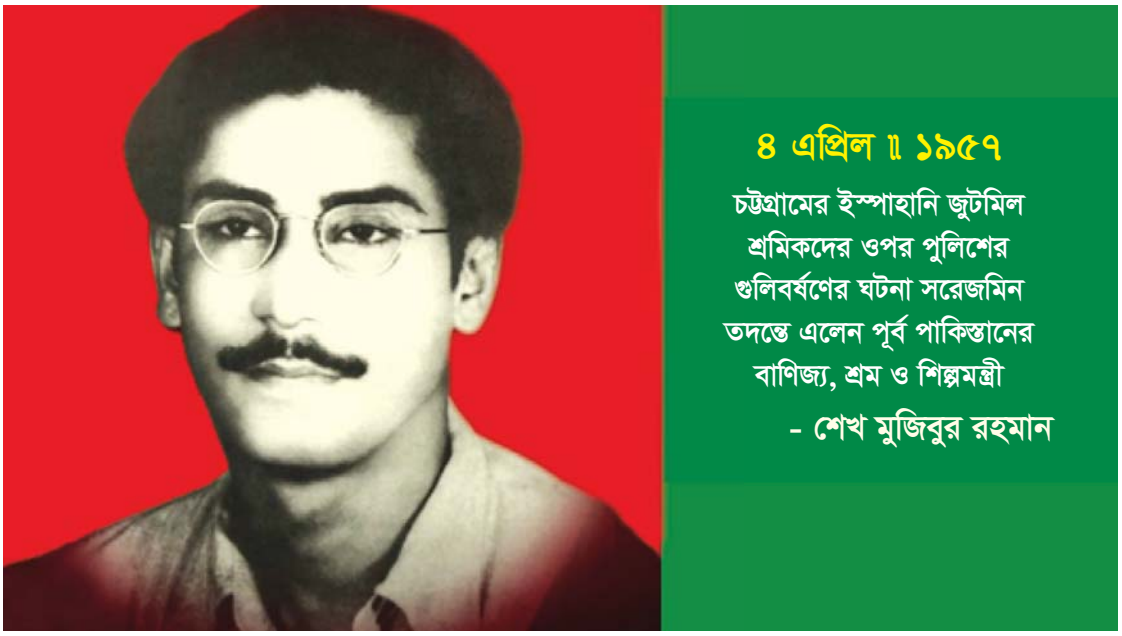

আরো আছে

স্কুল বন্ধ। শিশুরা বাড়িতে থাকছে। ওদের শরীরে পুষ্টির ঘাটতি যাতে না হয়, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে রাষ্ট্র চমৎকার একটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। সারা দেশের ত্রিশ লাখ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন সরকারি কর্মকর্তারা, স্কুলের শিক্ষকরা। তারা কী নিয়ে গেলেন শিশুদের জন্য? নিয়ে গেলেন পুষ্টিকর বিস্কুট। প্রতিটি শিশু পেল ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ প্যাকেট বিস্কুট। পুষ্টি বিতরণের এই কাজ চলবে বার বার। প্রথম ধাপ শেষ হয়েছিল মে মাসের ২০ তারিখে।

শিশুদের জন্য পুষ্টিকর বিস্কুট দেওয়ার এই কাজ এবারই শুরু হলো, তা নয়। সেই ২০১০ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরু করেছিলেন এই উদ্যোগ। এতে শিশুদের শরীর শক্তিশালী হয়। খিদে পেটে পড়তে হয় না বলে পড়ায় মন বসাতে পারে। গবেষণার ফলে জানা গেছে, পুষ্টিকর বিস্কুট কার্যক্রমের ফলে শিশুরা এখন স্কুল ফাঁকি দিতে চায় না। স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের সংখ্যা কমে গেছে। ক্লাসে আরো বেশি মনোযোগী হচ্ছে আমাদের শিশুরা। মহামারি কালে এই কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। শিশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই অনেক বড়ো খুশির খবর, তাই না?

এই সংকটের সময়ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে মায়েদের মোবাইলে পৌঁছে গেছে শিশুর উপবৃত্তির টাকা। প্রাথমিকের প্রায় এক কোটি চল্লিশ লাখ শিক্ষার্থী সরাসরি উপকার পেয়েছে এভাবে। ২০২০ সালের প্রথম দিনেই তো পাঠ্যবই বিনামূল্যে পেয়ে গেছে শিক্ষার্থীরা। এবারই প্রথম প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জামা, জুতা ও ব্যাগ কেনার জন্য এক হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে। কী আনন্দ শিশুদের! উপহার হিসেবে কেবল পাঠ্যবই নয়, জামা-জুতা-ব্যাগও পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তহবিল থেকে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ও করোনা ভাইরাস সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে দেশের কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য আট কোটি একত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।

মুজিববর্ষে শিশুদের জন্য আরেকটি খুব ভালো খবর আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় শিশুদের জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা সরকারি প্রতিষ্ঠান

গড়ে তোলার ঘোষণা এসেছে। এখন তো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিশু একাডেমির মাধ্যমে শিশুদের গড়ে তোলার কাজটি করা হয়। কেবলমাত্র শিশুদের জন্য কাজ করবে, এমন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিলেন। তোমাদের জন্য 'শিশু অধিদপ্তর' গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক সংস্থা 'সেভ দ্য চিলড্রেন' এই ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধীদের সেবায় চালু আছে '৯৯৯' কল সেন্টার। এই নাম্বারে ফোন করে সাহায্য চাইলেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনই নির্দেশ দেওয়া আছে। ফোন পাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে সাড়া দেওয়ার কাজটি মুজিববর্ষে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার তো এটাই। বাংলাদেশের শিশুদের মুখের হাসি যেন বজায় থাকে। শিশুরা তৈরি হতে পারে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ হিসেবে। এর জন্যই শিশুরা জানতে চাইছে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে। তিনি কীভাবে দেশটাকে ভালোবাসতেন, তা জানলে শিশুরাও ভালোবাসতে শিখবে নিজের দেশকে।

চলো বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে জানি

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনেক অনেক কথা জানতেও পারছি আমরা। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে 'বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন' শিরোনামে এক থেকে দেড় মিনিটের ছোট্টো তথ্যচিত্র দেখানো হয়। তোমরা দেখেছ এই তথ্যচিত্রটি? না দেখলে আজই দেখে নাও। জানতে পারবে প্রতিদিনের তারিখের সাথে মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের ঐ দিনে কী করেছিলেন, সেসব তথ্য। বঙ্গবন্ধুর লেখা স্মৃতিকথা, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার খবর থেকে তথ্য নিয়ে এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করা হচ্ছে।

তুমি যদি তোমার দেশের ইতিহাস, তোমার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস না জানো, তাহলে তুমি আত্মবিশ্বাসী হতে পারবে না। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি পৃথিবীতে টিকে আছে। স্বাধীনচেতা বলে সবাই চেনে বাঙালিকে। হাজার বছর ধরে বাঙালি স্বাধীনতা চেয়েছে, স্বাধীন ভূখণ্ড

চেয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ যুদ্ধ, ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ, লাখো মা-বোনের অপমান আর কোটি কোটি পরিবারের বুকফাটা কষ্টের বিনিময়ে বাংলাদেশ আমরা কীভাবে পেলাম, তা জানা খুব দরকার। তাহলে তুমি দেশকে নিয়ে গর্ব করতে পারবে। দেশের জন্য তুমিও হয়ে উঠবে অকুতোভয় যোদ্ধা। স্বপ্ন দেখতে পারবে দেশের জন্য কিছু করার।

এখনকার শিশু-কিশোর-তরুণ জানতে চায়। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে সংযুক্ত। যে–কোনো তথ্য পাওয়া এখন কত সহজ। তুমি চাইলেই ইন্টারনেটে খোঁজ করে জেনে নিতে পারো, জাতিসংঘে কে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। মুজিববর্ষ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জানতে আগ্রহী করে তুলেছে অনেককে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তবে সেসব দিবসে বঙ্গবন্ধু কী করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানছে সবাই। বুঝতে পারছে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর তরুণ বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালি এই পাকিস্তানে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে বাতিলই তো করে দিতে চাইল পাকিস্তানি শাসকরা। বাঙালিদের অনেকেই তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কিন্তু শুরু থেকেই ভাষার প্রশ্নে ছিলেন আপোশহীন। শুরু থেকেই তিনি প্রতিবাদী আর পাকিস্তান সরকারও তাঁর উপরই সব ক্ষোভ ঝাড়তে চাইল তাঁকে দিনের পর দিন কারাগারে আটকে রেখে। কেননা, তারা বুঝতে পেরেছিল, এই একজন বাঙালিকে চুপ করাতে পারলেই বাকিদের শোষণ করা সহজ হবে। ওরা ভুল ভেবেছিল, তাই না? বঙ্গবন্ধুকে ওরা চুপ করাতে পারেনি। তিনি বরং আর সব বাঙালিকেও প্রতিবাদী বানিয়ে ফেললেন। সবাই নেমে এল পথে। দেশকে স্বাধীন করে তবে ছাড়ল।

মুজিববর্ষে প্রস্তাবনার মধ্যে নানা প্রকাশনা আছে। এসবের মধ্যে শিশুদের জন্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা শিশুতোষ গল্পের একটি সংকলনও প্রকাশিত হবে। তোমাদের প্রিয় লেখক সেলিনা হোসেন এই সংকলনটির সম্পাদনা করছেন। 'মুজিব' নামের কমিক নভেলটি তোমাদের খুব পছন্দের হবে। এর এনিমেটেড ভার্সন প্রকাশের কাজ চলছে।

ইউনেস্কো ইতোমধ্যে সদস্য দেশগুলোতে মুজিববর্ষ পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, বিশ্বভারতীসহ আরো পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ইউনিভার্সিটি অব কেম্ব্রিজে বঙ্গবন্ধু সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। বঙ্গবন্ধুর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব আছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ইংরেজিতে কফি টেবিল বই, জীবনীগ্রন্থ, বাংলা ও ইংরেজিতে স্মারক গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ ইংরেজি ছাড়াও বারোটি ভাষায় প্রকাশিত হবে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে নানারকমের স্যুভেনির প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যস্ততা বেড়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল নির্মাণ করছেন 'বঙ্গবন্ধু' নামে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র।

অদম্য প্রেরণার মুজিববর্ষ থামবে না শত বাধাতেও

মুজিববর্ষ কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের বছর নয়। বঙ্গবন্ধুর ভাবনা, স্বপ্ন, আদর্শকে আমরা বুঝতে শিখব, মুজিববর্ষের মূল লক্ষ্য কিন্তু এটাই। যে মানুষটি বাঙালির মুক্তির জন্য তাঁর সারাটি জীবন উসর্গ করেছিলেন, বছরের পর বছর কারাগারে একাকী থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, পাকিস্তানি শাসকদের শত অত্যাচার সহ্য করেছেন, তাঁকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করব নিশ্চয়ই। এই দেশটি তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের শিশু হিসেবে তোমরা বেড়ে উঠছে। পরাধীন দেশের শিশুদের যে কষ্ট, তা তোমাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে না। এই কৃতজ্ঞতায় বাংলাদেশের সব শিশু হয়ে উঠুক এক একজন মুজিব আদর্শের সৈনিক। মুজিববর্ষে এ-ই আমাদের একান্ত চাওয়া। ■

শতাব্দীর সূর্য সন্তান

লিলি হক

বাবা-মায়ের আদরের খোকা
যার শৈশব-কৈশোর জুড়ে
মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে দিনমান কাটে
প্রজাপতির পাখনায় উড়ে উড়ে,
কর্মের সাধনায় অজস্র গোলাপ ফোটে থোকা থোকা।
জননীর কোল ছেড়ে দেশপ্রেমে স্বপ্ন বোনে
অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মিছিলে
আলোময় এক দ্যুতি মুক্তির প্রহর গোনে।
আজ ও আগামীর সোনামণিরা শোন রে পাতিয়া কান।
শিশু–কিশোরদের বড়ো ভালোবাসতেন শতাব্দীর
সূর্য সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে উৎসর্গীত
প্রাণ, তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে উনিশ'শত একাত্তরে
কেঁপেছিল ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
বজ্রকণ্ঠের শপথে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে
মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার আহবান, জেগেছিল শতকোটি
জ্বলজ্বলে রাঙা পোস্টার অম্লান।
নয় মাসের সংগ্রাম শেষে
বঙ্গবন্ধু ফিরলেন স্বাধীন দেশে বিজয়ীর বেশে।
দেশ গড়ার কাজে নিমগ্ন বঙ্গবন্ধু, সোনার বাংলা
গড়ে তোলার উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা, ঠিক
তখন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট !
শত্রুরা দিলো হানা, ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িটি যেন
রক্তের আলপনা। বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতিকে
ভালোবেসে বঙ্গবন্ধু আছেন, থাকবেন
আমাদের হৃদয়ে এই তো পরম পাওনা।

বঙ্গবন্ধু ও কৃষি

আব্দুস সালাম

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেন স্বাধীনতার পরে
গোলা ভরা থাকবে গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে
দারিদ্র্য আর ক্ষুধার কথা ভাবেন দিবা-নিশি
গুরুত্ব দেন সবার আগে আমার দেশের কৃষি।

গড়ে তোলেন কারখানা মিল বোর্ড কাউন্সিল কলেজ
সবুজ বিপ্লব যায় এগিয়ে বাড়তে থাকে নলেজ
সাড়া দিয়ে মেধাবীরা করেন শুরু যাত্রা
বাড়তে থাকে উৎপাদন আর উন্নয়নের মাত্রা।

পশুপাখি মাছ পরিবেশ সমন্বয় হয় সুষ্ঠ
কৃষক–শ্রমিক–কামার–কুমার সকলে হয় তুষ্ট
সকল বিভেদ দূর হয়ে যায় বজায় থাকে সখ্য
সোনার বাংলা হবে এদেশ এটাই প্রধান লক্ষ্য।

ছোটোদের বিশ্বকবি

মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর

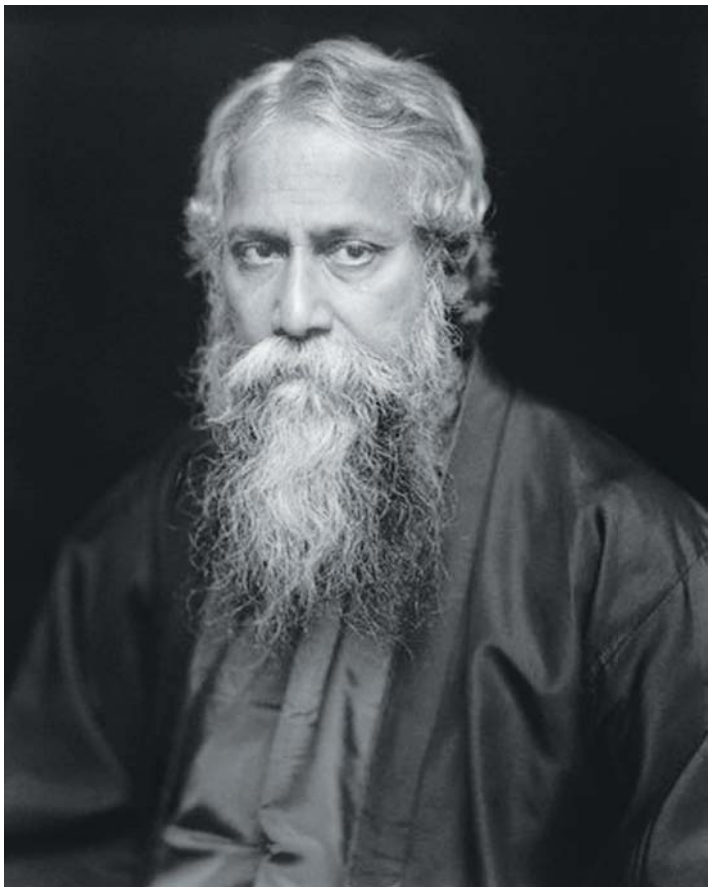

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি খ্যাত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই মে ১৮৬১ মোতাবেক ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ এবং ৭ই আগস্ট ১৯৪১ মোতাবেক ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে তিনি সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। কবি বাল্যকালে প্রথাগত বিদ্যালয়ে যাননি। গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই শিক্ষা লাভ করেছেন। আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর প্রথম 'অভিলাষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবি বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও প্রচুর লিখেছেন।

সাহিত্যের বিচরণ অনেক বিস্তৃত। বিশ্বের প্রায় সকল কবি– সাহিত্যিকেরাই ছোটোদের জন্য অবদান রেখে গেছেন এবং বর্তমানেও রাখছেন। ক্রমাগত সময়ে এ ধারা চলমান থাকবে। শিশুসাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রেখেছেন অসামান্য অবদান। কবির ছড়া– সাহিত্যে রেখে যাওয়া ভাবনার কিছুটা তুলে ধরছি।

বিশ্বকবি শিশুদের নিয়ে অনেক ভেবেছেন। নিজের শিশু সত্তার অতীত থেকে উপাদান আহরণ করেছেন তিনি। কবি ছোটোদের আলোর সন্ধান দিতে চেয়েছেন। এই আলো দিয়েই ভালোর সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করেছেন ছোটোদের। আলোর বানে প্রাণে বুনতে বলেছেন সত্যের বীজ। কবির ভাষায়-

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা।

কবি মল্লিকা-মালতীর মতোই শিশুদের আলোর ঢেউয়ে নাচতে দেখেছেন। কবির ভাষায়-

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
(আলো আমার আলো)

কবি শিশুদেরকে সোনা আর মানিক ভেবেছেন। যা গুণে গুণে শেষ করা যায় না। এরা ধরার পাতায় পাতায় রাশি রাশি হাসির পুলক ছড়ায়। নদীতে এরা বয়ে চলে কুলকুল ছন্দে। এরা নদীর ছন্দে ছন্দে সুধা ঝরায়। কবির স্বপ্ন বলে কথা! কবির স্বপ্ন সত্যি হোক সেই কামনাই করি।

বিশ্বকবির হাতে করা পেইটিং

কবি শিশুদের মনের আকুতি বুঝতেন। ভাবতেন ছোটোদের ইচ্ছামতীর কথা। তাই শিশুদের সূর্য-নদীর সাথে খেলার স্বপ্ন এঁকেছেন ছড়া-কবিতায়। কবির ভাষায়-

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে একখানি হই
ইচ্ছামতী নদী। (ইচ্ছামতী)

কবি শিশুদের দিন ও রাতের সাথে কথা বলার আকুতি খুঁজে পেতেন কবিতার পরতে পরতে। ছড়ার ছন্দমালায়। ছড়ার ডালিতে। কবির ভাষায়-

আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরই সাথে
আধেক কথা দিনের বেলায়
আধেক কথা রাতে। (ইচ্ছামতী)

কবি ভাবতেন, ভাবেন দেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে। কবি নিজের জন্মভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। কবির ভাষায়-

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে। (সার্থক জনম আমার)।

কবি তাঁর দেশের ধনসম্পদকে রানির মতো করে ভেবেছেন। এদেশের গাছের ছায়ায় এসে কবির অঙ্গ জুড়াত। কবির ভাষায়-

জানি নে তোর ধনরতন
আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে। (সার্থক জনম আমার)।

আমরা জানি দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। সবুজ–শ্যামল মায়ায় ঘেরা আমাদের এই দেশ বাংলাদেশ। এদেশের ফুল, পাখি, নদীনালা, খালবিল, চাঁদ-সুরুজ, বনবাদাড়ের সবকিছুই আমাদের আকুল করে। আপনার করে কাছে টানে। হৃদয়ের একটি পাশে আপনার করে ভাবতে শেখায়। শিশুরা যাতে জীবন চলার শুরু থেকেই দেশপ্রেমের জন্য প্রস্তুত হতে পারে কবির চাওয়া তাই। কবির আশার বাতিঘর এখানেই। আমরাও আমাদের দেশকে আপনার করে ভালোবাসব। দেশের কল্যাণে কাজ করব।

দেশ নিয়ে শত্রুতা করে অনেকেই। এদেশের স্বাধীনতা অনেকের কাছেই ভালো লাগে না। 'যে দেশে জন্ম সে দেশ নিয়েই শত্রুতা' কবি সেটা মেনে নিতে পারেননি। কবির ভাষায়-

কেঁচো কয়, নীচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ করে বলে, চুপ চুপ!

কবি দেশদ্রোহীদেরকে ঘৃণা করেন। ওদেরকে কীট ভাবেন! কবির চিন্তায় ওরা অমানুষ। ওদের চরিত্র কালিমায় ভরা। ওদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন কবি। কবি ওদেরকে চুপ করতে বলেছেন। কবির ভাষায়-

তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমার কি যশ!
(স্বদেশদ্বেষী)

সময় মানুষের জীবনে এক অমূল্য সম্পদ। সময় জ্ঞান নাই যাদের তারা জীবনে সফল হতে পারে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী হতে হলে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। শিশুরা সময় সচেতন হবে না, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শিখবে না এমনটি কোনো কবিই আশা করেন না। তাই সময়ের ব্যাপারে শিশুরা যাতে সচেতন হতে পারে সেদিকেও নজর দিয়েছেন বিশ্বকবি। হাস্যোজ্জ্বলে ছোটোদের সচেতন করেছেন সময়ের ব্যাপারে। কবির ভাষায়-

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম; কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, দশটা বাজাই বন্ধ।'
(সময়হারা)

বিপদ-আপদ মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী। জীবনে চলার পথে বিপদ আসবে এটা স্বাভাবিক। তাই বলে কী ভেঙে পড়বে শিশুরা? ওরা কী হতাশায় ভুগবে? নাকি সাহসী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যাবে সামনে! দুঃখকে করতে হবে জয়। বিজয়ের মালা পরতে হবে গলায়। স্বপ্ন বীজ বুনতে হবে মানুষের হৃদয় জমিনে। হৃদয়ের গহিনে। কবির ভাষায়-

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করতে পারি জয়।
(আত্মত্রাণ)

পরের জন্য ভালো অনেক কিছুই করতে হবে। অন্যের ক্ষতি করতে নেই কিছুতেই। সৃষ্টিকর্তা যেমন সবাইকে ভালোবাসেন, কারও ক্ষতি করেন না তিনি, ঠিক তেমনি কবিও ছোটোদেরকে পরের কল্যাণে কাজ করতে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছেন। অন্যের জন্য কিছু করতে হলে নিজের জীবনে ক্ষতি হতেই পারে। এটাকে কবি মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। কবির ভাষায়-

এই করেছ ভালো, নিঠুর হে,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো। (এই করেছ ভালো)

একজন কবি স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতের। ভালো কিছু করতে চান কবিরা। কবিদের চেতনায় স্বপ্নের বীজ রোপিত হয়। আর সেই বীজ থেকেই অঙ্কুরিত হয় সুবিশাল বটবৃক্ষ। যে বৃক্ষের ছায়ায় এসে প্রশান্তি পায় হাজারো পিপাসিত পথিক। একটু জিরিয়ে নেয় বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে। পথিক আবার ফিরে চলে নিজের গন্তব্যের পানে। অনাগত মঞ্জিলপানে। কবি অনাগত শিশুদেরকেও বটবৃক্ষের মতো করেই গড়ে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বীরের বেশে ওরাই ফুল ফুটাবে জনতার মাঝে। স্বপ্নভাঙা অসহায়দের পাশে সোনার তরী ভিরাবে শিশুরাই। ওরা স্বপ্ন পাখি। কবির ভাষায়-

হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর-
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, হারে, রে রে রে রে।'
(বীর পুরুষ)

কবির আহ্বানে আজও তাই আজকের ছোটোদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে সত্যের আহবানে। সততার জয়গানে গেয়ে উঠতে হবে বিজয়ের গান। সাম্যের সমাজ গঠনে আমাদের পথচলা করতে হবে আরো শাণিত। আরো বেগবান হতে হবে আমাদের উদ্যোগী ভুমিকা। জয় হোক শিশু কিশোরদের। বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের, 'বীর পুরুষেরা' জেগে উঠুক আপন সত্তায়। নিজস্ব প্রতিভায়। জাতি গঠনে আবারো শিশুরা এগিয়ে আসুক আপনার করে। একান্ত নিজের করে। ওদের প্রচেষ্টায় শান্তির নিবাস হোক আমাদের এই ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ বসুন্ধরা। ■

অভিধান দেখা

তারিক মনজুর

বিনুদের বাসায় একটা বাংলা অভিধান আছে। কিন্তু কখনো বিনু সেটা উলটিয়ে দেখেনি। কারণ বাংলা অভিধান দেখা অনেক কষ্ট। হঠাৎ তার মনে হলো, আচ্ছা, এখন তো স্কুল বন্ধ রয়েছে। ভাষা-দাদুর কাছ থেকে অভিধান দেখা শিখে নিলেই হয়!

বিনু ফোন দিলো ভাষা-দাদুকে, 'দাদু, আমাকে বাংলা অভিধান দেখা শেখাবে?'

দাদু তখন সকালের নাশতা সেরে পত্রিকা হাতে নিয়েছেন। বিনুর কথা শুনে খুশি হলেন। বললেন, 'আমি পত্রিকার শিরোনামগুলো একটু পড়ে নিই। ততক্ষণে তুমি বাংলা অভিধান আর কাগজ-কলম নিয়ে বসো।'

বিনু বাংলা অভিধান আর কাগজ-কলম নিয়ে আবার ভাষা-দাদুকে ফোন দিলো। ভাষা-দাদু বললেন, 'বিনু, তুমি কি ইংরেজি অভিধান দেখতে পারো?'

'হ্যাঁ, পারি। কিন্তু বাংলা অভিধান পারি না।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'বাংলা হোক আর ইংরেজি হোক, অভিধান দেখার প্রক্রিয়া আসলে একই। ধরো, CAT, BALL, ANT অভিধানে এই শব্দগুলোকে কোনটার পরে কোনটা পাওয়া যাবে বলতে পারো?'

বিনু হেসে বলল, 'কেন পারব না? অভিধানে সবার আগে আছে ANT, তারপর আছে BALL, এরপর CAT।'

'ঠিক! A দিয়ে শব্দ আগে থাকে। এরপর থাকে B দিয়ে শব্দ, C দিয়ে শব্দ, D দিয়ে শব্দ...'

বিনু বলল, 'দাদু, এ তো আমি জানি!'

দাদু বললেন, 'জানো ভালো কথা। তোমাকে আরেকটু পরীক্ষা করে নিই। এবার B দিয়ে কয়েকটা শব্দ বলি। B A L L, B A T, BAG, BIRD এগুলো কোনটার পরে কোনটা আছে অভিধানে?'

বিনু বলল, 'দাঁড়াও ভাষা-দাদু, আগে আমি শব্দগুলো খাতায় লিখে নিই।' এই বলে খাতায় সে শব্দগুলো লিখল। তারপর সাজিয়ে নিল অক্ষর অনুযায়ী –

B A G
B A L L
B A T
B I R D

এরপর বলল, 'অভিধানে সবার আগে আছে BAG, তারপর B A L L, তারপর B A T, তারপর B I R D।'

দাদু বললেন, 'দারুণ! কিন্তু তুমি কীভাবে পারলে?'

বিনু বলল, 'সবগুলো শব্দেরই প্রথম অক্ষর B। তাই আমি দ্বিতীয় অক্ষরের দিকে তাকিয়েছি। BAG, BALL, BAT এসব শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে আছে A। তাই এই তিন শব্দ আগে হবে। আর B IR D শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে আছে I। তাই B I R D পরে হবে।'

'মানলাম। কিন্তু B A G, B A L L, B A T এই তিন শব্দ সাজালে কী করে?'

বিনু বলল, 'দ্বিতীয় অক্ষর যখন মিলে যায়, তখন তৃতীয় অক্ষরের দিকে তাকাতে হয়। B A G শব্দে তৃতীয় অক্ষর G, BALL শব্দে তৃতীয় অক্ষর L, আর B A T শব্দে তৃতীয় অক্ষর T। তৃতীয় অক্ষরের দিকে তাকিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোনটার পরে কোনটা থাকবে।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, অভিধানের শব্দগুলো অক্ষর অনুযায়ী সাজানো থাকে।'

'কিন্তু দাদু, বাংলা অভিধানেই তো যত সমস্যা!'

ফোনে বিনুর কথা বলার ভঙ্গি শুনে দাদু হেসে ফেললেন। বললেন, 'ইংরেজি অভিধান তুমি দেখতে পারো। অতএব বাংলা অভিধান দেখতে খুব বেশি সমস্যা হবে না তোমার। ...তুমি আগে আমার মতো করে বর্ণগুলো লেখো।' এরপর ভাষা-দাদু বলতে লাগলেন –

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ং ঃ ঁ
ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ
ত ৎ থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য য় র ল
শ ষ স হ

ফোনে শুনে শুনে বিনু সব বর্ণ ঠিক ঠিক লিখে ফেলল। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, ভাষা-দাদু অনুস্বার, বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দুকে আগে বলেছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু অনুস্বার, বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দু শেষে হবে না?'

ভাষা-দাদু বললেন, 'এখানেই ভুল করে সবাই। বাংলা অভিধানের বর্ণক্রম আর ছোটোদের বইয়ের বর্ণক্রম একরকম নয়। বর্ণ শিক্ষার বইয়ে ং, ঃ, ঁ শেষে থাকে। কিন্তু অভিধানে এগুলো থাকে স্বরবর্ণের পর পরই।'

'কী বিদঘুটে ব্যাপার! কিন্তু এর কারণ কী দাদু?'

'বিদঘুটে লাগতে পারে তোমার কাছে। কিন্তু জেনে রাখো, এক সময় বর্ণমালায় ং, ঃ, ঁ ছিল স্বরবর্ণের শেষে। তাই এগুলোকে ব্যঞ্জনের আগেই পাওয়া যায় অভিধানে।'

'তাহলে অভিধানে পুরানো নিয়মেই শব্দ সাজানো আছে?'

'হ্যাঁ, তাই।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'একই সাথে খেয়াল করো, ড বর্ণের পরে ড়-এর অবস্থান; ঢ বর্ণের পরে ঢ়-এর অবস্থান; ত বর্ণের পরে ৎ-এর অবস্থান; আর য বর্ণের পরে য়-এর অবস্থান। ...এখন এই অবস্থানগুলো মনে রেখে তুমি অভিধানে শব্দ খুঁজবে।'

'আমাকে তাহলে কয়েকটা শব্দ দিয়ে দাদু পরীক্ষা নাও তো দেখি!'

ভাষা-দাদু বললেন, 'তাহলে কয়েকটা শব্দ বলি। কলম, জাম, ঘর, খই – কোনটার পরে কোনটা হবে, বলো দেখি।'

বিনু কাগজে শব্দ চারটা লিখল। তারপর বলল, 'এটা তো সহজ। এখানে ক সবার আগে হবে। তাই কলম অভিধানে আগে থাকবে। এরপর খ দিয়ে খই থাকবে, ঘ দিয়ে ঘর থাকবে, আর জ দিয়ে জাম থাকবে।'

'বেশ। এবার ক দিয়ে চারটা শব্দ বলি। কলা, কলম, কেশ, কাজ – কোনটার পরে কোনটা হবে?'

বিনু কাগজে শব্দগুলো লিখল। তারপর খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'এবার তো পারছি না, দাদু!'

ভাষা-দাদু বললেন, 'সূত্র কিন্তু সব আগের মতো। তুমি এখন মিলাবে ক-এর সাথে অ, ক-এর সাথে আ, ক-এর সাথে ই... এভাবে।'

বিনু শব্দগুলোর দিকে আবার তাকাল। তারপর বলল, 'কলম, কলা, কাজ, কেশ। হয়েছে, দাদু?'

'হয়েছে। কিন্তু ব্যাখ্যা ছাড়া আমি তোমার উত্তর নেব না।'

বিনু বলল, 'ক-এর সাথে অ আছে কলম। আর কলা শব্দে ক-এর সাথে আ আছে। কাজ শব্দে ক-এর সাথে এ আছে। কেশ শব্দে ক-এর সাথেই স্বরবর্ণ দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু কলম কেন আগে আর কলা কেন পরে?'

'কলম আর কলা শব্দে প্রথম অক্ষর একই রকম। তাই আমি দ্বিতীয় অক্ষরের দিকে তাকিয়েছি। কলম শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে আছে ল-এর সাথে অ। আর কলা শব্দে দ্বিতীয় অক্ষরে আছে ল-এর সাথে আ।'

'দ্বিতীয় অক্ষরও একই রকম হলে কী করতে?'

'কেন, তখন আমি তৃতীয় অক্ষরের দিকে তাকাতাম!'

ভাষা-দাদু বললেন, 'দুর্দান্ত! এখন তাহলে সাহস করে অভিধান দেখতে শুরু করো। সমস্যা হলে আবার ফোন করবে।' ■

গল্প

ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ি

নুরুল ইসলাম

বাবার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল হামিম। যেতে যেতে জানতে চাইল, বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি? হামিমের মুখের দিকে তাকালেন বাবা। বললেন, ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ি।

– সত্যি। আনন্দে লাফিয়ে উঠল হামিম।
– হ্যাঁ, সত্যি। আজ আমরা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি।
– বাবা, ওই বাড়িতে রাসেল থাকতো।
– তুমি জানো?

– হ্যাঁ। দাদুভাই আমাকে রাসেলের গল্প বলেছেন। রাসেল ছিল আমাদের বয়সি। দাদু তাকে বলেন, ছোটো রাজপুত্র।

– তুমি ঠিকই জেনেছো। রাসেল বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে ছোটো ছেলে।

কথায় কথায় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা।

– হামিম, এই তো ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়ি। তোমার রাসেলের বাড়ি। এই বাড়িতে রাসেল থাকত। রাসেলের বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থাকতেন। মা শেখ ফজিলাতুন্নেছা থাকতেন। রাসেলের দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা থাকতেন। দুই ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল থাকতেন।

– বাবা, চলো ভেতরে যাই। বাবাকে তাড়া দিলো হামিম।

ভেতরে ঢুকতেই এক চিলতে উঠোন। উঠোনের চারিদিকে তাকায় হামিম। এই উঠোনেই হাঁটতে শিখেছে রাসেল। দৌড় দিয়েছে। আছাড় খেয়েছে। চিৎকার করেছে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে। হামিম বার বার এদিকে– ওদিকে তাকায়। না, আজ কোথাও রাসেল নেই।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই কানে এলো বাকবাকুম বাকবাকুম শব্দ। আঙিনার এক পাশে কবুতরের

খোপ। অনেকগুলো কবুতর সেখানে। কোনোটা উড়ছে। কোনোটা খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে। কোনোটা একটানা বাকবাকুম বাকবাকুম করে যাচ্ছে।

– হামিম, দেখেছ?
– কী বাবা?
– ওই যে কবুতরগুলো।
– দেখেছি বাবা।

– রাসেল কবুতর খুব ভালোবাসতো। দিনের অনেক সময় তার কেটে যেত কবুতর দেখতে দেখতে। মাঝে মাঝে ওগুলোকে খেতে দিত। রাসেলের ছিটিয়ে দেওয়া খাবারগুলো যখন কবুতর খেতো, রাসেল তখন আনন্দে হাততালি দিত।

দোতলার দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল হামিম। সামনে রাস্তা। রাস্তার ওপাশে লেক। জলভরা লেক ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ভেসে আসছে দখিনা বাতাস।

বাবা বললেন, শেখ মুজিব এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাঁর ডাকেই জেগে উঠেছিল বাঙালি। এই বাড়িটি তখন হয়ে ওঠে মুক্তিকামী মানুষের কেন্দ্র।

দলে দলে মিছিল আসতো। যখনই মিছিল আসতো বঙ্গবন্ধু এই বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাতেন। তারপর নিচে গিয়ে তাদের কথা শুনতেন। বক্তব্য দিতেন। সাহস দিতেন।

– বাবা, চলো ওই ঘরে যাই।
– চলো।

সাজানো আছে রাসেলের জুতো। দুইটা সাইকেল। রাসেলের প্রিয় সাইকেল।

– বাবা দেখো, দেখো সাইকেল। দাদুভাই আমাকে গল্প শুনিয়েছিল। খুব সাইকেল চালাতো রাসেল।
– হ্যাঁ, ওর বন্ধু ছিল আদিল, আউয়াল, ইমরান। তারাও সাইকেল চালাতে ভালোবাসতো। ওরা সবাই মিলে সাইকেলে টইটই করে ঘুরে বেড়াতো। প্রতিযোগিতাও করতো।

– তাতে কে জিতত বাবা?
– তুমিই বলো।
– রাসেল জিতত।
–কী করে বুঝলে?
– জানি না বাবা। শুধু আমার মনে হয়, ছোটো রাজপুত্র হারতে পারে না।

বাবা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা সিঁড়ির ধারে। পেছন পেছন দাঁড়ালো হামিম। সিঁড়িটা দিয়ে নিচে নামা যায় না। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা।
– বাবা, এখান দিয়ে কি আমরা নিচে নেমে যাবো?
– না, এখান দিয়ে নামা যায় না। দেখছ না, বন্ধ করা।
– কেন বাবা?
– এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। শেষবারের মতো নামতে নামতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।
– বাবা! চমকে উঠল হামিম।
– হ্যাঁ। যে নেতা আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখালেন। মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলেন। যাঁর জন্যে আমরা পেয়েছি এই বাংলাদেশ। সেই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এ দেশেরই মানুষ।
– বাবা, আমি শুনেছি। ১৫ই আগস্ট রাতে ঘাতকরা এই বাড়িতে ঢুকে সবাইকে হত্যা করেছে।
– ঠিকই শুনেছো। রাসেলের দুই বোন ছিল বিদেশে। তাই তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন। আর সবাইকে মেরে শেষমেষ গুলি করেছিল রাসেলকে। রাসেল তখন মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল।

হামিম সিঁড়ির দিকে তাকালো। লাল রক্তের দাগ লেগে আছে। বঙ্গবন্ধুর শরীরের শেষ রক্তবিন্দু। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে গুলির চিহ্ন। রাসেলের মায়ের রক্তমাখা শাড়ি। বঙ্গবন্ধুর গায়ে পড়া সেই গেঞ্জিটা। রক্তের দাগ লেগে আছে তাতেও। আর সেই ভেঙে যাওয়া চশমা। যেটা সিঁড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথেই গড়িয়ে পড়েছিল।

– বাবা, চলো বাসায় যাই।
– যাবে? নিজের চশমা খুলে চোখ মুছে বললেন বাবা।

– যেতে যেতে কয়েকবার পেছন ফিরে তাকালো হামিম। ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িটা তাকিয়ে আছে। যেন বার বার ডাকছে হামিমকে। ■

গল্প

বঙ্গবন্ধু ও রিপন

আবুল হোসেন আজাদ

ভোরের পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভেঙে যায় রিপনের। এখনো বাইরে আবছা অন্ধকার। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠেও ফজরের নামাজের আজান শেষে হয়েছে। সূর্য উঠতে তখনো অনেক বাকি। বিছানায় উঠে বসে রিপন। কনকনে শীত। তবু পুবের দিকের জানালাটা খুলে বাইরে তাকায়। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে ঘরে ঢুকে শীতটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। চারিদিক কুয়াশার চাদরে ঢাকা। কিছুই দেখতে পায় না রিপন। জানালাটাকে বন্ধ করে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

আজ বিজয় দিবস। রিপন ক্লাস ফাইভে পড়ে। ওদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। ওদের প্রাইমারি স্কুল আর হাই স্কুল একই জায়গায়। তাই প্রাইমারি ও হাই স্কুল মিলে আজকে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সারাদিন ব্যাপী। কখন ফরসা হবে। কখন কুয়াশা কেটে গিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সূর্য উঠবে সেই ভাবনার গভীরে ডুব দিয়ে রিপন আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ে বলতে পারে না। মা'র ডাকাডাকিতে ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ে রিপন।

স্কুলে যেতে হবে। সকাল সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত। তারপর মার্চপাস্ট ও বিজয় মিছিল বেরুবে রাস্তায়। ঝটপট তৈরি হয়ে নেয় রিপন। মা'র দেওয়া সকালের নাশতা সেরে বেরিয়ে পড়ে। ওদের বাড়ি থেকে স্কুল খুব কাছাকাছি। প্রায় মিনিট পাঁচেকের পথ। তখনো সাতটা বাজেনি। রিপন স্কুলে এসে পড়ে।

হাই স্কুল ও প্রাইমারির ছাত্রছাত্রী ও স্যারেরা সবাই এসে গেছে। একটু পরেই শুরু হবে অনুষ্ঠান। দুই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরাও সবাই উপস্থিত। সেই সাথে সর্বস্তরের আশপাশের গ্রামের লোকজন।

ঠিক সময়েই শুরু হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত। ধীরে ধীরে সারিবদ্ধভাবে বিজয় মিছিলের আগে প্রাইমারি ও তার পিছনে হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। গ্রামের পথ এখন আর কাঁচা নেই। সব রাস্তা পাকা পিচ ঢালা। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি। শাল, সেগুন, মেহগনি, কড়ুইসহ আম, জাম ইত্যাদি। এখনো গাছের পাতার শিশির টুপটাপ ঝরছে। কুয়াশা ফাঁকা হয়ে, রোদের কিরণ পড়েছে গাছগাছালির পাতায় পাতায়। বিজয় মিছিল প্রায় আধা কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়ে ওরা স্কুলে ফিরে আসে। দুপুর একটা পর্যন্ত চলবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিকেলে বিচিত্রানুষ্ঠান। বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ একাত্তরের রণাঙ্গনের অত্র এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। রিপনের দাদুভাইও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনিও উপস্থিত থাকবেন অনুষ্ঠানে। রিপনের বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার দাদুভাই যুদ্ধ করেছেন দেশের হয়ে পাকিস্তানদের বিপক্ষে।

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ হয়। দুপুরে নামাজ ও খাওয়ার বিরতি। এবার বিকেলের বিচিত্রানুষ্ঠান। মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও শুরু হয় এক সময়। এক এক করে হাই স্কুলের প্রশান্ত স্যার নাম ডেকে মঞ্চে তুলে নেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয় প্রাইমারি স্কুলের কয়েক জন ছাত্রছাত্রীরা। রিপন বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের দলে তার দাদুভাইও আছেন। দাদুভাই ছিলেন মুজিব বাহিনীতে। দাদুর কাছ থেকে রিপন মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক গল্প শুনেছেন। সে সব গল্প যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি ভয়ংকরও। কীভাবে মুক্তিসেনারা পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে লড়াই করেছেন বীরবিক্রমে।

সংবর্ধনার এক পর্যায়ে একাত্তরের যুদ্ধ ও জাতির পিতার মহান স্বাধীনতার স্বপ্ন ও অবদান সর্ম্পকে মুক্তিযোদ্ধারা সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখেন। রিপন তন্ময় হয়ে শোনে বঙ্গবন্ধুর কথা। শুধু রিপন কেন, উপস্থিত সবাই শোনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামের কথা।

রিপনের দাদুভাই সামাদ সাহেব। বয়স পঁয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই। তিনি যখন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন তখন তার বয়স সাড়ে পনেরো। সেবার এস.এস.সি পরিক্ষার্থী ছিলেন। প্রশান্ত স্যারের ঘোষণায় তিনি এবার আসন থেকে লাউড স্পিকারের সামনে চলে এলেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে শুরু করলেন তার বক্তব্য। তিনি শুরু করলেন - আজ আমি তোমাদের, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলব। তিনি যদি না জন্মাতেন তাহলে হয়ত আমরা একটি স্বাধীন দেশ, একটি লাল-সবুজের পতাকা পেতাম না। তিনি জন্মেছিলেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। তিনি আমাদের জন্য স্বাধীনতা এনে দিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। মার্চ ও ডিসেম্বর মাস বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় মাস। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের ঢাকা ও চট্টগ্রামে একযোগে গভীর রাতে আক্রমণ করে নিরীহ নিরস্ত্র জনতার উপরে। সেইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে ওরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় পাকিস্তানে। তাঁরই স্বাধীনতার ঘোষণায় আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রিপন দাদুভাইয়ের কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুকে মনেপ্রাণে আরো গভীরভাবে অনুভব করে সে। মনে মনে ভাবে রিপন - আহা! একবার যদি তাঁকে দেখতে পেতাম তবে কতই না ভালো লাগত। মন জুড়িয়ে যেত।

রিপন ও অন্যান্যরা মুক্তিযোদ্ধা দাদুভাইয়ের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে চায়। কিন্তু শীতের বেলা। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মাগরিবের আজানের সাথে সাথে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। তাই উনিও কথা বেশি বলতে পারবেন না। তবে যেটুকু সময় আছে সেটুকু বলবেন। উনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন। তোমাদের মতো বয়সে বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলা কেটেছে মধুমতি নদীতে সাঁতার কেটে, বর্ষায় ভিজে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে, বাবুই পাখির বাসা খুঁজে, মাছরাঙার ডুব দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য দেখে। তিনি ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন দয়ালু। গরিবদের সাহায্য করতেন। অন্যায় দেখলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। কৈশোর থেকেই বঙ্গবন্ধু অধিকার সচেতন ছিলেন। একবারের ঘটনা– শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি গোপালগঞ্জে আসেন স্কুল পরিদর্শনে। কিশোর বঙ্গবন্ধু তখন তাঁর স্কুলে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তখন বেলা ডুবু ডুবু প্রায়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ ঝিমিয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে সিঁদুরে লাল আভা উঁকি দিচ্ছে। ঠান্ডাও পড়া শুরু করেছে বেশ। রিপনের দাদুভাই বললেন - আমরা দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনি। আমাদের মহান নেতা তখন পাকিস্তানের কারাগারে। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন পাকিস্তানের কারাগার থেকে। সেই থেকে তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য ও উন্নয়নের জন্য রাতদিন কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কতিপয় বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদল বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে পরিবারসহ হত্যা করে। এমনকি শিশু রাসেলকেও। রাসেলের হাসু আপু জার্মানিতে থাকতেন। রাসেল হাসু আপুর কাছে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বর্বর সেনাদের হাত থেকে সে প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়েছিল দোতলার সিঁড়িতে। দাদুভাইয়ের গলাটা আড়ষ্ট হয়ে উঠে। রিপন দাদুভাইয়ের কথা শুনতে শুনতে চোখের পানি বন্ধ করতে পারে না। টিপটিপ করে চোখের পানি দু'গাল বেয়ে ওর সোয়েটার ভিজিয়ে দেয়। ডুকরে কেঁদে ওঠে রিপন। মসজিদ থেকে তখনই মুয়াজ্জিনের মাগরিবের আজান আল্লাহু আকবর... আল্লাহু আকবর... ■

বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা

মাহফুজুল ইসলাম

উনিশশ'সত্তর সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু যখন নির্বাচনি প্রচার করতে এক গ্রামে গিয়েছিলেন, তখন এক ভিক্ষুক নারী বঙ্গবন্ধুকে তার ঝুপড়ি ঘরে নিয়ে তাঁর হাতে ভাংতি পয়সার এক টাকা দিয়ে বলেছিল—

'আপনাকে দেওয়ার মতো কিছু নেই, তবে আমার এই ভিক্ষা করা এক টাকাই আপনাকে দিলাম নির্বাচন খরচ বাবদ। বঙ্গবন্ধু প্রতিউত্তরে বলেছিলেন, আমাকে দোয়া করুন যেন আমি জয়ী হয়ে গরিব, মেহনতি মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারি, এই এক টাকাই আমার দোয়া। নির্বাচনে জয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধু পরে ঐ ভিক্ষুক নারীকে নিজের বাসায় এনে ফুলের মালা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

চার আনা পয়সা, পান আর দুধ

চুয়ান্নর নির্বাচন। গোপালগঞ্জ –কোটালিপাড়া থেকে আওয়ামী প্রার্থী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রামে গ্রামে হেঁটে প্রচারণা চালাতেন। রাস্তাঘাট নেই, যাতায়াতের খুবই অসুবিধা। নির্বাচন চালানোর জন্য মাত্র দুটি সাইকেল ছিল। কর্মীরা যার যার নিজের সাইকেল ব্যবহার করত। জনমত বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। যে গ্রামেই যেতেন জনসাধারণ শুধু ভোট দেওয়ার ওয়াদা করত। একবার খুবই গরিব এক বৃদ্ধা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে বঙ্গবন্ধু যাবে। বঙ্গবন্ধুকে দেখে হাত ধরে বলল, 'বাবা, আমার এই কুঁড়েঘরে তোমায় একটু বসতে হবে।', মাটিতে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান ও চার আনা পয়সা এনে বলল, 'খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।' বঙ্গবন্ধুর চোখে পানি এল। দুধ একটু মুখে নিয়ে বললেন, 'তোমার দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট, তোমার দোয়ার মূল্য টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।' বৃদ্ধা মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে বলল, 'গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা। নীরবে বঙ্গবন্ধু চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'মানুষরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না। এ দেশের লোক আমাকে কত্ত ভালোবাসে' *['অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে]*। ■

গল্প

বালক দলের রাজা

ইমরুল ইউসুফ

এক গ্রামে এক রাজপুত্রের জন্ম হলো। রাজপুত্রের রূপে ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। সারা বাড়িতে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। ছেলের মা-বাবা ভীষণ খুশি হলেন। ছেলের নানা-নানি খুশি হলেন যেন আরো বেশি। ফুটফুটে রাজপুত্রের নানা ওই বাড়ির মানুষ ছাড়াও আশপাশের সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালেন। কারণ এই পরিবারে ছেলে সন্তানের জন্ম হয় খুব কম। ছেলের নাম তখনো রাখা হয়নি। মা তাকে আদর করে খোকা বলে ডাকে। সবাই তাই বলে। আবার কেউ কেউ মিয়া ভাই বলেও ডাকে। এমন ডাক শুনতে খোকার খুব একটা খারাপ লাগে না। একদিন খোকার মনে হলো একা একা পুকুরে গোসল করবে।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে খোকা বলে, 'মা আমি পুকুরে গোসল করব।'

এই কথা শুনে মায়ের বুক কেঁপে উঠল। গিমাডাঙ্গা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৌকা উলটে খোকার পানিতে পড়ে যাওয়ার কথা মনে হলো। এজন্য তার মুখটা আরো ভার হলো। দুই মেয়ের পর এই ছেলের জন্ম। এজন্য আদরের শেষ নেই। তাছাড়া বর্ষাকাল। পুকুরভরা পানি। যদি আবার কোনো বিপদ হয়!

মা বললেন, 'না পুকুরে একা একা গোসল করা যাবে না। তোমার বুবুদের সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি বলে দিচ্ছি।'

খোকাদের বাড়ির কাছেই পুকুর। উঠোন পেরিয়ে পুকুরে যেতে হয়। কিন্তু গোসলে যাওয়ার আগে একটু না খেললে হয়? খোকা তাই খেলতে শুরু করে। খোকা যখন উঠোনে খেলা করে তখন সব তার দখলে থাকে। সারাক্ষণ সে হাঁস-মুরগি তাড়িয়ে বেড়ায়। গাছে ঢিল ছোঁড়ে। এটা ফেলে। ওটা ধরে। পাখির বাসা ভাঙে। তারপরও বড়োদের চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ নেই। খালা বা ফুপুদের কোনো ছেলে সন্তান ছিল না। এজন্য খোকার প্রতি আদরের মাত্রাও ছিল অনেক বেশি। খোকার পায়ে কাদা লাগলে কে খোকার পা ধুইয়ে

দিবে তা নিয়ে বোনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। এ বিষয়টি খোকা খুবই উপভোগ করতো। ভাবতো– বড়ো বোনদের এমন আদর আর ভালোবাসা যদি সারাজীবন পাওয়া যেত!

গোপালগঞ্জের সেই রাজপুত্র ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগল। প্রাথমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে হাই স্কুলে যাওয়া শুরু করল। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুব ভালোবাসেন। ক্লাসের ছাত্ররাও তাকে খুব পছন্দ করে। কারণ স্কুলের যে-কোনো অনুষ্ঠানে খোকা থাকে সবার মধ্যমণি। ফুটবল, ভলিবল, হাডুডু খেলায় ক্যাপ্টেন। খোকা খুব ভালো ফুটবল খেলে। ভালো বক্তৃতা দেয়। ফুটবল খেলতে গিয়ে একদিন মজার একটি ঘটনা ঘটল।

মাঠে দুই দলের মধ্যে খেলা হচ্ছে। রোগাপাতলা খোকা দৌড়াচ্ছে বাতাসের বেগে আর ঢুপঢাপ পড়ছে। একবার জোরে কিক দিতে গিয়ে নিজেই উলটে পড়ল মাটিতে। দর্শকরা এই দৃশ্য দেখে হৈ হৈ করে উঠল। তালি বাজাতে লাগল। কিন্তু খোকার মনোযোগ খেলায়। খোকা হাত পা ঝেড়ে আবার ফুটবলে জোরসে কিক দিলো। বল যে কোথায় গেল! শুরু হলো খোঁজাখুঁজি।

টুঙ্গিপাড়া গ্রামে খোকার অনেক সুনাম। খোকা ভালো ফুটবলার। দলবেধে মাছ ধরায় ওস্তাদ। গুলতি দিয়ে পাখি মারায় কঠিন শিকারি। দুষ্টামিতেও কম যায় না। এজন্য খোকা হয়ে উঠেছে ওই গ্রামের বালক দলের রাজা। সবাই খোকার পিছন পিছন থাকতে ভালোবাসে। খোকার কথা শোনে। খোকার কথা মানে।

একদিন পাখি শিকারে গিয়ে খোকা দেখতে পেল গাছের আড়ালে একটি পাখি পড়ে আছে। পাখিটির ডানা ভেঙে গেছে। কষ্টে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পাখিটিকে দেখে তার খুব মায়া হলো। সে যত্ন করে পাখিটাকে বাসায় নিয়ে এল। ওকে যত্ন করে খাইয়ে সুস্থ করে তোলাই তখন তার প্রধান কাজ। ওইদিন আর গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করা হলো না তার।

শুধু একটি পাখি নয়। সবার বিপদে-আপদে খোকা আগে এগিয়ে আসে। গরিব-দুখিদের বইপত্র, কলম, পেনসিল, জামা, চাদর, ছাতা দিয়ে সাহায্য করে।

একদিন বাইরে তুমুল বৃষ্টি। খোকা স্কুল থেকে ভিজতে ভিজতে বাড়িতে এল। খোকার দাদি জানতে চাইল ছাতা কোথায়? খোকা বলল, 'এক বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছি। স্কুল থেকে ওর বাড়ি অনেক দূর। অতটা পথ ভিজতে ভিজতে যাবে কী করে? বৃষ্টির দিনে সে স্কুলে আসতে পারে না। কারণ ওর ছাতা নেই। এজন্য ছাতাটা ওকে আমি একেবারেই দিয়ে দিয়েছি।'

কথাটা শুনে দাদি খুব অবাক হন। আবার ভালোও লাগে। দাদি খোকার মাকে ডেকে বলে, 'বউমা তোমার ছেলে একদিন কিছু একটা হবে।'

মা বললেন, 'ওর বাবা তো চায় খোকা জজ ব্যারিস্টার হোক।'

'তুমি কী চাও বলো তো বৌমা?'

'আমি চাই আমার ছেলে বড়ো কিছু হোক। তার অনেক নামডাক হোক। সবাই তাকে ভালোবাসুক। আমার ছেলে যেন সবার কাছে প্রিয় মানুষ হয়ে থাকে।'

'তা নিশ্চয় হবে। আমি ওকে দোয়া করি।'

'কিন্তু বৌমা ও যে প্রতিদিন স্কুলে যায় আর একেকটি ঘটনা ঘটিয়ে আসে এর কী হবে?'

'কী আর হবে মা। খোকা যে মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এটা আমার ভালো লাগে। মানুষের প্রতি ওর দরদ একটু বেশি। ওর বাবা এসব শুনে মুখ খুলে কিছু বলে না। তবে আমি বুঝতে পারি খোকার এসব কাজে উনি খুশিই হন।'

বাবার অফিসে কয়েক দিনের ছুটি হয়েছে। ছুটি পেলেই খোকার বাবা কর্মস্থল থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে আসেন। কারণ বাড়িতে মা-বাবা-স্ত্রী-সন্তান থাকে। বাবা যেদিন বাড়িতে আসেন সেদিন বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মজার মজার রান্না হয়। খোকা বাবার বাড়ি আসার সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আসার সময় বাবা অনেক ফলমূল, খাবার-দাবার নিয়ে আসেন। যদিও সে ব্যাপারে খোকার কোনো আগ্রহ নেই। খোকার ভালো লাগে বাবার কাছ থেকে নানারকম গল্প শুনতে। বাবাও খোকার কাছে জানতে চান এই কদিনে বাড়িতে, স্কুলে কী কী ঘটেছে।

সামনেই খোকার গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন হাই স্কুলে বড়ো একটি অনুষ্ঠান আছে। ওই অনুষ্ঠানে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। সঙ্গে থাকবেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা তাই খুব ব্যস্ত। স্কুলের ক্লাসরুম, বারান্দা পরিষ্কার করা হচ্ছে।

পরিষ্কার বারান্দায় গাছ থেকে একটি ঝরা পাতা উড়ে এসে পড়ল। হেড স্যার কাউকে কিছু বললেন না। নিজেই ঝট করে পাতাটা তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। দুই সপ্তাহ আগেই ছাত্রছাত্রীদের বলে দেয়া হয়েছে। ওইদিন যেন সবাই পরিষ্কার পোশাক পরে, নখ-দাঁত পরিষ্কার করে স্কুলে আসে। স্যারের নির্দেশমতো খোকাও সুন্দর ঝকঝকে পোশাক পরে স্কুলে গেল। পোশাকে যেন ময়লা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখল। সেদিন স্কুলে গিয়ে খেলাধুলো করল না।

বন্ধুদের বলল, 'আজ কেউ দুষ্টামি করবি না। স্যাররা যখন যেটা বলবেন সেটা শুনবি। অতিথিরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত হইচই করবি না।'

এই কথা বলে অপেক্ষা করতে লাগল কখন অতিথিরা স্কুল পরিদর্শনে আসবেন।

ভালোয় ভালোয় অতিথিদের স্কুল পরিদর্শন শেষ হলো। অতিথিরা ডাক বাংলোর দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একদল ছাত্র হঠাৎ তাঁদের পথ আগলে দাঁড়াল। ছাত্রদের এমন কাণ্ড দেখে হেড স্যার তো অবাক।

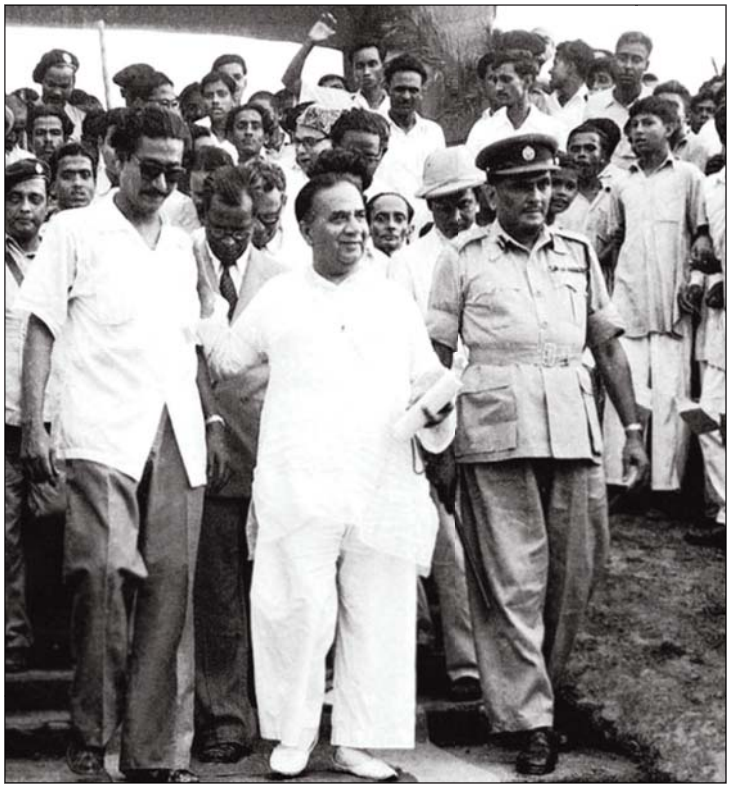

তিনি বললেন, 'এই তোমরা কী করছো? রাস্তা ছেড়ে দাও।'

ছাত্ররা হেড স্যারের কথা শুনলেন না। হ্যাংলা-পাতলা লম্বা ছিপছিপে খোকা গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে।

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাও?'

বুকে সাহস নিয়ে খোকা উত্তর দিল, 'আমরা গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশনারি হাই স্কুলের ছাত্র। আমাদের স্কুলের ছাদে ফাটল ধরেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই সেখান থেকে পানি পড়ে। আমাদের বই-খাতা ভিজে যায়। ক্লাস করতে অসুবিধা হয়। স্যারদের কাছে এ ব্যাপারে বার বার বলা হলেও কোনো ফল হয়নি। ছাদ মেরামতের জন্য আর্থিক সাহায্য না দিলে রাস্তা মুক্ত করা হবে না।'

খোকার এই কথার সাথে পাশে থাকা ছাত্ররাও গলা মেলাল।

বলল, 'আমাদের দাবি মানতে হবে। আমাদের কথা শুনতে হবে।'

কিশোর ওই ছাত্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আর সাহসে মুগ্ধ হয়ে হক সাহেব জানতে চাইলেন, 'ছাদ সংস্কার করতে তোমাদের কত টাকা দরকার?'

সাহসী কণ্ঠে খোকা জানাল, 'বারো শত টাকা।'

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমি তোমাদের স্কুলের ছাদ সংস্কারের ব্যবস্থা করছি।'

তিনি তাঁর তহবিল থেকে সেই টাকা মঞ্জুর করলেন।

খোকার সাহসিকতার এই খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল। বাবা-মা-বোনদের কানে গেল এই খবর। সবাই খুব খুশি হলো। স্যারেরাও খুব খুশি হলেন। ছাত্ররা খোকাকে নিয়ে আনন্দ করতে লাগল।

বলল, 'তুই আমাদের রাজা।'

স্যারেরা বললেন, 'আমাদের গ্রামে সত্যিই সাহসী এক রাজপুত্রের জন্ম হয়েছে।' ■

বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসায় শিশুরা

মেজবাউল হক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন প্রিয় মানুষের নাম। ছিলেন ছোটো-বড়ো সবার কাছে সমান প্রিয়। কারণ তিনি সবাইকে ভালোবাসতেন। খুব সহজে আপন করে নিতেন। মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল ভীষণ মায়া। বিশেষ করে শিশুদের ভালোবাসতেন খুব বেশি। স্নেহ, মমতায় ভরে দিতেন। সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। শিশুদের সবকিছুকে সহজে বুঝতে পারতেন তিনি। ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন খুবই দরদি।

তিনি দেখলেন, কোনো ছেলে ভীষণ গরিব, টাকার অভাবে ছাতা কিনতে পারে না, রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছে, অমনি তাঁর ছাতাটা দিয়ে দিতেন। কিংবা টাকার অভাবে কোনো ছেলে বইপত্র কিনতে পারছে না, দিয়ে দিলেন নিজের বইপত্র।

বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে বঙ্গবন্ধু গ্রামগঞ্জে যেতেন, চলার পথে শিশুদের দেখেই গাড়ি থামাতেন। কথা বলতেন, সময় থাকলে গল্প করতেন। খোঁজখবর নিতেন। গরিব শিশুদের কাছে টেনে নিতেন। কখনো কখনো নিজের গাড়িতে উঠিয়ে অফিসে বা নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। নানান উপহার দিয়ে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে বড়ো ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৬৩ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের বড়ো নেতা। সেই সময়ই তিনি শিশুদের টানে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে কচি-কাঁচার মেলা আয়োজিত শিশু আনন্দমেলায় এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তখন বলেন, 'এই শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাই মনটাকে একটু হালকা করার জন্য।' বঙ্গবন্ধুর এই কথার মধ্য দিয়ে শিশুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

১৯৭২ সালে একদিন কচি-কাঁচার মেলার কিছু খুদে বন্ধু তাদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধের ছবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন গণভবনে যায়। প্রায় তিনশ ছবি আঁকে শিশুরা। এর মধ্যে বাছাই করা ৭০টি ছবি রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই দেখান বঙ্গবন্ধুকে। ছবিগুলো

বঙ্গবন্ধু রাশিয়া সফরের সময় সে দেশের শিশুদের জন্য নিয়ে যাবেন শুভেচ্ছা-উপহার হিসেবে। বঙ্গবন্ধু আগ্রহভরে শিশুদের আঁকা ছবিগুলো দেখছিলেন আর ছবির আঁকিয়েদের প্রশংসা করছিলেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'আমার দেশের শিশুরা এমন নিখুঁত ছবি আঁকতে পারে, এসব না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।' তিনি শিশুদের সঙ্গে সে দিন প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটান এবং যত্নের সঙ্গে খাবার পরিবেশন করেন।

শিশুদের প্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু শিশুদের কল্যাণে ১৯৭৪ সালের ২২শে জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) জারী করেন। এই আইনের মাধ্যমে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিশুদের প্রতি সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন- আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিতে হবে আজকের শিশুদেরই। তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল, মননশীল এবং মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে- তিনি সবসময় সেটাই চাইতেন। অহিংসা, মানবপ্রেম, ভালোবাসা দিয়ে সমাজে যে আদর্শ বঙ্গবন্ধু নির্মাণ করে গেছেন তার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই।

নবারুণের পক্ষ থেকে শিশুবন্ধু বঙ্গবন্ধুর প্রতি রইল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ■

১৯৩৭ সালে নদী ভাঙনের পর স্থানান্তরিত ইসলামিয়া হাই স্কুল, মাদারীপুর। বর্তমানে স্কুলটির শুধু অব্যবহৃত কাঠামো আছে। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবন

মো. মনজুর হোসেন পাটোয়ারী

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। সে সময়ে বাংলায় শিক্ষার এবং শিক্ষিতের হার ছিল কম, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পরিবারে শিক্ষার চর্চা ছিল। শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা হতো। বঙ্গবন্ধুকেও শৈশবে স্কুলে ভর্তি করা হয়। তিনি প্রথম যে স্কুলে ভর্তি হন সেটি ছিল টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি মিডল ইংলিশ বা সংক্ষেপে এমই স্কুল ছিল। স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খান সাহেব শেখ আব্দুর রশিদ। তিনি বঙ্গবন্ধুর ছোটো দাদা। সে সময়ে প্রথম ও একমাত্র ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল এটি।

সে সময়েই বঙ্গবন্ধু পরিবারের শিক্ষা প্রসারে অবদান ছিল। আর সেই শিক্ষা ছিল আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। সাত বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু প্রথম স্কুলে ভর্তি হন। সালটি ছিল ১৯২৭ । বঙ্গবন্ধুরা ছিলেন ছয় ভাই-বোন। চার বোন, দুই ভাই। তিনি ছিলেন তৃতীয়। বাবা শেখ লুৎফর রহমান চাকরি করতেন। চাকরির প্রয়োজনে থাকতেন মহকুমা শহর গোপালগঞ্জেই। এতে অনেক অসুবিধে হতো বলে পরিবারের সদস্যদের গোপালগঞ্জে নিয়ে আসেন।

নয় বছর বয়সে ১৯২৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে ভর্তি করা হলো গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। এটি তাঁর জীবনের দ্বিতীয় স্কুল। এই স্কুলে তিনি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এ স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর বেরিবেরি রোগ হয়। চিকিৎসা করাতে বঙ্গবন্ধুকে কলকাতায় নেওয়া হয়। এ জন্য দুবছর পড়ালেখা বন্ধ থাকার পর ১৯৩৬ সালে বঙ্গবন্ধুর বাবা মাদারীপুরে বদলি হলে বাবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুও চলে যান। সেখানে ভর্তি করা হলো মাদারীপুর হাই স্কুলে। এটা তার তৃতীয় স্কুল। এখানে পুনরায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর চোখের রোগ গ্লুকোমায় আক্রান্ত হলেন তিনি। এবারও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায়।

কলকাতা থেকে চোখের চিকিৎসা শেষে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন বাবার কর্মস্থল মাদারীপুরে। ততদিনে সহপাঠী বন্ধুরা উঠে গেছে ওপরের ক্লাসে। বঙ্গবন্ধুর বাবা তাঁকে নিয়ে আসলেন গোপালগঞ্জে। ভর্তি করে দিলেন গোপালগঞ্জ মথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুল, সালটি ছিল ১৯৩৭। এটা তার জীবনের চতুর্থ ও শেষ স্কুল। এ স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলও করেন বঙ্গবন্ধু। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবনে বিঘ্ন ঘটেছিল।

স্কুলজীবনে বঙ্গবন্ধু অনেক খেলাধুলা করেছেন। ভালো ফুটবল খেলতে পারতেন। পাশাপাশি সমবয়সি ছেলেদের নিয়ে একসঙ্গে মিলে সমাজের উন্নতির চেষ্টাও করতেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র থাকাকালে মুসলিম সেবা সমিতির কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে বঙ্গবন্ধু এ সমিতির সম্পাদকও হন।

স্কুলে পড়াকালীন সময়েই বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। ছাত্র থাকাকালীন ১৯৪০ সালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হন। তাই আমরা বলতেই পারি বঙ্গবন্ধুর স্কুল জীবন ছিল ঘটনাবহুল। ■

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু

রাশেদুল হক

যেসব বরেণ্য ব্যক্তির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। বাঙালি জাতির ইতিহাসের মহানায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আত্মপ্রকাশ ঘটে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে। তিনি ছাত্রাবস্থায় তৎকালীন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলন থেকে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যতগুলো আন্দোলন হয়েছে প্রত্যেক আন্দোলনের পেছনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধিটি দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। অথচ বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারেননি। সাধারণ মানুষের দাবি আদায়ে বিসর্জন দিয়েছিলেন ছাত্রত্ব। যখন আবার সময় হলো বরণের তখন বিসর্জন দিলেন নিজের জীবন।

শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ বিএ ডিগ্রি গ্রহণ করে ১৯৪৭ সালে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি সে বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। সে সময় আইন বিভাগের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন অধ্যাপক এম ইউ সিদ্দিক। বঙ্গবন্ধুর রোল নম্বর ছিল-১৬৬। আইনের ছাত্র শেখ মুজিব তখন এসএম হলের সংযুক্ত ছাত্র হলেও থাকতেন মোগলটুলিতে। একটি সাইকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল আইন শিক্ষা শেষ করে নিপীড়িত জনগণের সেবায় ব্রতী হবেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের অনাবাসিক ছাত্র হলেও তিনি ক্যাম্পাস জীবনের অধিকাংশ সময়ই আড্ডা দিতেন ফজলুল হক মুসলিম হলের পুকুর পাড়ে। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ফজলুল হক হল মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৩

হয়। এ সংগঠনের অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আত্মপ্রকাশ । পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি তুলে ধরার লক্ষ্যে তিনি ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ফজলুল হক হলের ছাত্র সমাবেশে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘট করে। তখন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কোনো নিয়োগপত্র দেওয়া হতো না। মুখের কথায় চাকরি হতো। আবার মুখের কথায় চাকরি চলে যেত। সে সময় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দৈনন্দিন কাজের কোনো সময়সূচি ছিল না। তাদের কোনো বাসস্থান ছিল না। যখন-তখন কাজের জন্য ডাকা হতো। যে কোনো কাজ করতে তাদের বাধ্য করা হতো। তাদের সাথে কৃতদাসের মতো ব্যবহার করা হতো।

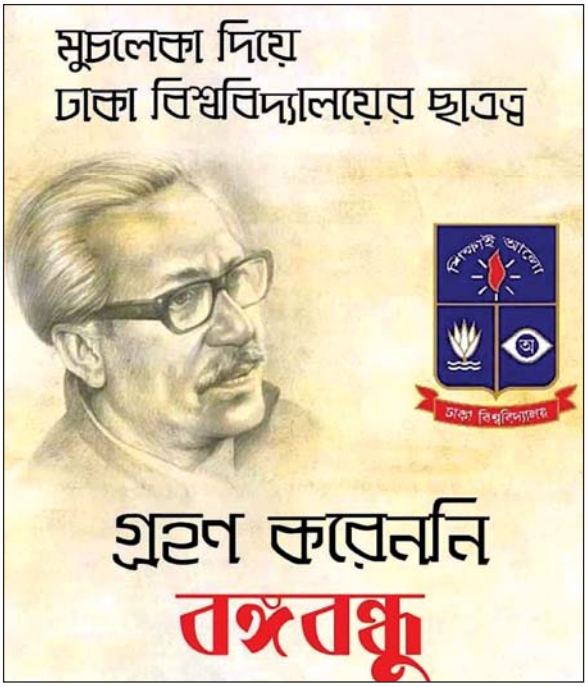

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের এসব দাবির প্রতি বঙ্গবন্ধুসহ বহু ছাত্রনেতা সর্মথন জানান। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমর্থনকারী ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের ইঙ্গিতে বঙ্গবন্ধুসহ ২৭ ছাত্রকে এজন্য বহিষ্কার ও জরিমানা করা হয়। প্রথম ছয়জনকে চার বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। পরের ১৫ জনকে তাদের আবাসিক হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপরের চারজনকে ১৫ টাকা জরিমানা করা হয় এবং শেষের একজনকে ১০ টাকা জরিমানা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে ১৫ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ছাত্ররা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রথম ছয়জনকে বহিষ্কার ছাড়া সবার শাস্তি মওকুফ করে দেয়। তবে শাস্তি মওকুফকৃত ছাত্রদের লিখিত ক্ষমা চাইতে এবং ভবিষ্যতে ভালো হয়ে চলার জন্য লিখিত মুচলেকা দিতে বলা হয়। সবাই মুচলেকা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব গ্রহণ করলেও বঙ্গবন্ধু তা করেননি। তিনি বহিষ্কৃত ছাত্রদের নিয়ে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন। তখন উপাচার্য ছিলেন ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন। বঙ্গবন্ধু তাকে বলেন, ছাত্রদের বহিষ্কারের পূর্বে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল তাদের বক্তব্য শোনা। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া।

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে ২৭শে এপ্রিল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। পুলিশ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। জেলে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু বলেন, আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসব। তবে ছাত্রনেতা হিসেবে নয়, একজন দেশকর্মী হিসেবে। মাত্র আড়াই বছর পর বঙ্গবন্ধু আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে উপস্থিত হন এক রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে এদেশের মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং ৯ মাস মরণপণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। দেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। যে বিশ্ববিদ্যালয় একসময় তাঁর ছাত্রত্ব কেড়ে নিয়েছিল, বহিষ্কার করেছিল, সে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বরণ করার প্রস্তুতি নেয়। বঙ্গবন্ধু তখন শুধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নন, জাতির পিতাও। ১৯৭২

সালের ৬ই মে তিনি তাঁর প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসেন। কলাভবনের সামনে বটতলায় বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সে সমাবেশে তাঁর সামনে তাঁর বহিষ্কারাদেশ পত্রের কপিটি ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধু এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আরো দুবার আসেন। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে ছাত্ররা অটোপ্রমোশনের জন্য শিক্ষকদের ঘেরাও করে রাখলে শিক্ষকদের উদ্ধারের জন্য তিনি আসেন। পরে আলোচনা করে এ সমস্যার সমাধান করা হয়। সে বছর আরেকবার ডাইনিং-এ রুটির পরিবর্তে ভাতের দাবিতে ছাত্ররা উপাচার্যকে তার বাংলো বাড়িতে ঘেরাও করলে উপাচার্যকে উদ্ধারের জন্য বঙ্গবন্ধু প্রটোকল ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে চলে আসেন এবং ছাত্রদের রুটির পরিবর্তে ভাত দেওয়ার আশ্বাস দেন। তখন ছাত্ররা ঘেরাও তুলে নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন একটি হল (স্যার এএফ রহমান হল) নির্মাণের জন্য তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মতিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর কাছে অনুরোধ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ সঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব, ১৯৬২

দেশ পুনর্গঠনের জন্য তখন বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এত টানাটানির মধ্যেও বঙ্গবন্ধু নতুন এই হল নির্মাণে বরাদ্দ দেন। ফলে স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন একটি ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। মূলত বঙ্গবন্ধুর কারণেই তা সম্ভব হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গবন্ধু তখন রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকার বলে চ্যান্সেলর। এই খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। শিক্ষকগণ সেদিন বঙ্গবন্ধুর জন্য ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ছাত্র-শিক্ষকগণ বঙ্গবন্ধুকে সামনে থেকে দেখা এবং তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য প্রহর গুণছিল। কিন্তু অপেক্ষার পালা আর শেষ হয় না ওই দিন। ভোরে একদল বিপথগামী সৈন্য বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ সংবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়ার সব আয়োজন পড়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশূন্য এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এভাবেই বিয়োগান্তক অবসান ঘটে '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের দিনটি। অবাক করার মতো একটি বিষয় হলো বঙ্গবন্ধু কোনোদিন ছাত্রত্ব বাতিলের জন্য আবেদন করেননি, এমনকি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও না । কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬১ বছর পর ২০১০ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে মর্যাদায় ভূষিত করে। এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রতি তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অন্যায় ছিল। শেখ মুজিবকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বরখেলাপ করা হয়েছিল। 'বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র, ন্যায় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার পক্ষের আন্দোলন। তাই এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আরো এক ধাপ এগোলো।' ■

নিবন্ধ

বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধু

শাহানা আফরোজ

এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে ১৯৪২ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কলকাতায় পড়তে আসা। ভর্তি হন ইসলামিয়া কলেজে। ওয়েলেসলি স্ট্রিটের এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। প্রথমেই থাকা হয় বড়ো বোন আসিয়া খাতুন ও শেখ নুরুল হকের পার্ক-সার্কাসের বাসায়। দ্রুত কলেজে মুজিব হয়ে উঠলেন পরিচিত মুখ। তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর থিয়েটার রোডের বাড়িতে।

রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে শেখ মুজিবের পক্ষে বোন আসিয়া খাতুনের বাসায় বেশিদিন থাকা সম্ভব হলো না। ১৯৪৩ সালের শেষভাগে তিনি চলে এলেন তালতলার ৮ নং স্মিথ লেনের বেকার হোস্টেলে। কলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ১৮৯৬ সালে নির্মিত টেইলর হোস্টেলের চারপাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অপর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থার কারণে ১৯০৮ সালে নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য আন্দোলন হয়। এর ফলে কলকাতায় বেকার হোস্টেল নির্মিত হয়। এই হোস্টেলের সুপার ছিলেন অধ্যাপক সাইদুর রহমান। তাঁকে (বঙ্গবন্ধু) বরাদ্দ দেওয়া হলো তৃতীয় তলার ২৪ নং কক্ষটি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সুপার লক্ষ করলেন যে মুজিবের নিজের রুমে অর্থাৎ ২৪ নং ঘরে সবসময় কোনো না কোনো গেস্ট থাকেন। মুজিবকে প্রিন্সিপাল জুবেরী সাহেব ও সুপার সাইদুর রহমান সাহেব খুবই স্নেহ করতেন। মুজিব ছাত্রদের বিপদে-আপদে

সাহায্য করেন। কার হোস্টেলে সিট প্রয়োজন, কার ফ্রি সিট দরকার সব ব্যাপারে মুজিবের কথাই চূড়ান্ত। অধ্যাপকরা জানেন যে, মুজিব কখনো অন্যায় আবদার করেন না। কিন্তু তাঁর কাছে এই অতিথি আসার ঢল তাদের চিন্তিত করে তুলল। কারণ মুজিবের রুম সিট না পাওয়া পর্যন্ত অনেকেরই জন্য মুজিবের রুম ছিল ফ্রি। এই কারণে মুজিবের পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হচ্ছে। সুপার অধ্যাপক সাইদুর রহমান তাঁকে পড়াশুনার জন্যে ২৩ নং ঘরটি বরাদ্দ করে দিলেন। তিনি কঠোর নির্দেশ দিলেন যে ২৩ নং ঘরে মুজিব পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবেন।

১৯৪৬–এর কলকাতা দাঙ্গার পরে নোয়াখালী ও বিহারে দাঙ্গা হলো। দাঙ্গা বিধ্বস্ত উদ্বাস্তুদের জন্যে আসানসোলে তৈরি হলো ক্যাম্প। তার দায়িত্বে ছিলেন শেখ মুজিব। ক্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পনেরো দিন থাকতে হলো হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে হোস্টেলে ফিরে মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন যে স্বল্প সময়ে পড়াশোনা করে হলেও পরীক্ষাটা তিনি দেবেন।

এরপর হোস্টেল ছেড়ে তিনি বইপত্র নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলেন হাওড়ায় বন্ধু শেখ শাহাদাত হোসেনের বাসায়। সেখানে কয়েকমাস থাকার পরে পরীক্ষার ঠিক আগে এসে বোনের বাসা পার্ক সার্কাসে উঠলেন। বসলেন বি এ পরীক্ষায়। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে অনার্সসহ ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

কলকাতায় পড়াশোনার পাঠ শেষ করলেও আজো আছে তাঁর স্মৃতি বিজরিত বেকার হোস্টলের ২৩ ও ২৪ কক্ষ। সবুজ রঙের লোহার গেট পার করে বেশ পুরনো স্থাপনা তিনতলা দালান,অনেকটা জায়গা জুড়ে এই ছাত্রাবাসের লম্বা লম্বা জানালা দরজা। কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে যেতে হবে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত ২৩ ও ২৪ নম্বর রুমে। তৃতীয়তলার কক্ষগুলো প্রবেশের পর দেখা যাবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কারাজীবন পাথরে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করা। সামনে গিয়ে দেখা মিলবে চোখে চশমা, মুজিব কোট পরিহিত শ্বেতপাথরে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য। ২৪ নম্বর কক্ষে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর পড়ার চেয়ার-টেবিল, একটি কাঠের আলমারি, খাট, বঙ্গবন্ধুর একটি আলোকচিত্র আর বেশ কিছু বইপুস্তক। কলকাতা শহরের বেকার হোস্টেলটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম ছাত্রদের জন্য একরকম আশীর্বাদ। এক নামে বেকার হোস্টেলকে সবাই চেনে। ভারতবর্ষের রাজনীতির অবিস্মরণীয় সব ইতিহাস বেকার হোস্টেলকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই বেকার হোস্টেলকে আরো বেশি স্মরণীয়-বরণীয় করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । ■

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর অমর কিছু বাণী

মঞ্জুর করিম খান

যে নামটি বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জীবনের নানা চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে মধুমতী নদীর তীর থেকে এসে তিনি জয় করেছেন কোটি মানুষের হৃদয়। জাতির পিতার মুখ নিঃসৃত উচ্চারণগুলোই যেন অমর বাণী। এই মহান নেতার সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের দেয়া কিছু বাণী তোমাদের জন্য-

- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
- যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও সে একজনও যদি হয় তার ন্যায্যকথা আমরা মেনে নেবো।
- 'কোনো জেল জুলুমই কোনোদিন আমাকে টলাতে পারেনি, কিন্তু মানুষের ভালোবাসা আমাকে বিব্রত করে তুলেছে'।
- 'আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। আন্দোলনের জন্য নিঃস্বার্থ কর্মী হতে হয়, ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। সর্বোপরি জনগণের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার'।
- সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই তারা জনগণের বাপ, জনগণের ভাই, জনগণের সন্তান, তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।
- আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবসি।
- আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।
- গণ আন্দোলন ছাড়া গণ বিপ্লব হয় না।
- যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কেউ তাকে মারতে পারে না।
- যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।
- গরিবের উপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে।
- দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্যে দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।
- এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়। ■

করোনায় মেনে চলবে স্বাস্থ্যবিধি

নুসরাত হক

করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বিশ্ব একরকম অবরুদ্ধ। অন্যদিকে ঘরে বন্দি থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠছে মানুষ। সবাই আশা করছে হয়ত আর কিছু দিনের মধ্যেই এই মহামারির অবসান ঘটবে। তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, বিশ্বের কোনো নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক এমন কোনো সুখবর দিতে পারছেন না। বরং উলটোটাই বলছেন। তাদের কথা হলো,বিশ্ববাসীকে সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদে করোনার সাথে বসবাস করতে হবে।

সবার মুখেই এখন এক প্রশ্ন কবে আসবে টিকা। নানা দেশ ও সংস্থা নিজেদের মতো করে কোভিড-১৯ টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।

গবেষণাগারে পরীক্ষা পর্যন্ত শুরু করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তারপরও এখনো প্রচুর সময় প্রয়োজন। মানবদেহে পরীক্ষার পর প্রথমেই সেটা নিরাপদ কিনা দেখতে হবে। তারপর দেখতে হবে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে কিনা এবং সেটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। সব কিছু ঠিকভাবে যাচাই বাছাই করার পর শুরু হবে বাণিজ্যিক উৎপাদন। সেখানেও পেরুতে হবে নানা ধাপ।

ধর্মীয় অনুশাসন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপনই প্রত্যেক ধর্মের মূলমন্ত্র। কাজেই দীর্ঘমেয়াদে করোনার সাথে বসবাস করতে হলে দেশে সব নাগরিককে সরকার ঘোষিত বিধিনিষেধ ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা জরুরি। এরজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ঘরে থাকা। নিয়মিত ধর্মীয় বিধান মেনে চলা এবং সচেতনতাই পারে করোনা ভাইরাস থেকে সবাইকে রক্ষা করতে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি নিয়মিত হালকা ব্যায়াম ও হাঁটাচলা করতে হবে।

করোনার এই সময়ে একটি অতি পরিচিত শব্দ সামাজিক দূরত্ব। এ সামাজিক দূরত্ব মানে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের দূরত্ব নয় বরং সংক্রমণ এড়াতে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির দৈহিক দূরত্ব বা ফিজিক্যাল ডিসটেন্স। বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে যে দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন তাহলো নূন্যতম তিন ফুট। সমাজের একজন থেকে আরেকজনের দূরত্ব। কিছু ক্ষেত্রে হয়ত মনে হতে পারে যে, সামাজিক দূরত্বের জন্য একটা মানসিক দূরত্বও তৈরি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যিনি বিষয়টি নিয়ে সচেতন তাকে অপরজনকে সচেতন করতে হবে। তাকে ভালোভাবে সচেতন করতে হবে যে, এটা আমাদের বাঁচার লড়াই। সাময়িকভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার এবং অন্যকে বাঁচানোর লড়াই।

এখন যেখানেই যাই না কেন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই আমাদের চলতে হবে। কার শরীরে এই ভাইরাস লুকিয়ে আছে তা খালি চোখে দেখে বোঝা অসম্ভব। আবার অনেকের মধ্যে এ ভাইরাস থাকলেও কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখলে আমরা বাঁচতে পারব।

বাড়ির বাইরে গেলে, যেখানে নিজে সংক্রমিত হতে পারি, অন্য কাউকে সংক্রমিত করতে পারি, সেখানে সামাজিক দূরত্বের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা মানে অপ্রয়োজনে এমন কোথাও না যাওয়া যেখানে লোকের ভিড় আছে। নিজে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে সব কিছু করা। আর এতে সংক্রমণের আশঙ্কাও কম।

আমাদের দেশের যারা খেটে খাওয়া মানুষ তারা বেশিরভাগই নিরাপদ দূরত্ব কি তা বুঝতে চায় না। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, আপনারা একে অপর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। বার বার কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন, মাস্ক পরবেন, কমপক্ষে তিন ফুট দূরে দূরে থাকবেন। এতে আপনিও ভালো থাকবেন, আপনার পরিবার বা আশপাশে যারা আছে তারাও ভালো থাকবেন। তাই আমরা সবাইকে বলব নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলুন।

পৃথিবীতে কোনো বিপদই চিরস্থায়ী নয়। আমরা আশাবাদী একদিন করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কার হবে। কিন্তু যতদিন না হচ্ছে, ততদিন আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে, মানতে হবে নিয়ম এবং সরকারি নির্দেশনা। ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মেনে চললে করোনাসহ সব ধরনের বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পাব ইনশাল্লাহ। ■

তরুণ নেতার তালিকা

ছয় বাংলাদেশির মধ্যে চারজনই নারী

জান্নাতে রোজী

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা উইমেন ডেলিভারের 'তরুণ নেতাদের' এক তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের ছয়জন। এর মধ্যে চারজনই নারী। তারা হলেন- তানজিলা মজুমদার, নওশীন চৌধুরী, মোহসিনা আক্তার ও নাফিসা তাসনিম। সম্প্রতি সংস্থাটি ৩০০ তরুণ নেতার এ তালিকা প্রকাশ করে।

লিঙ্গ সমতা, নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে কাজ করে বৈশ্বিক সংস্থা উইমেন ডেলিভার। তাদের কাজকে সুসংহত করতেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তরুণ নেতা নির্বাচন করা হয়। সংস্থার বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এবারের তালিকায় বিশ্বের ৯৬টি দেশ থেকে ৫ হাজার ৬০০ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে ৩০০ জন নির্বাচিত করা হয়েছে। যাদের মধ্যে কেউ যুক্ত আছেন শিক্ষা ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবায়, কেউবা সোচ্চার নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে, কেউ যুক্ত আছেন জলবায়ু ও পরিবেশ রক্ষায় আর কেউ কাজ করছেন দরিদ্র মানুষের ক্ষমতা নিয়ে।

নওশীন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের নির্বাহী ব্যবস্থাপক হিসেবে আরবান কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। দায়িত্ব পালন করছেন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা পশ্চিম অংশের সহসভাপতি হিসেবেও।

তানজিলা স্বাস্থ্য কর্মসূচির একজন জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার তরুণ দলকে। যুক্ত আছেন আরো কিছু স্বেচ্ছাসেবী কাজের সঙ্গে।

নাফিসা তাসনিম ঢাকার আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নড়াইল জেলায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা দেন, বিনা পয়সায় সেবা দেন ফেসবুকেও।

মোহসিনা আক্তার কাজ করেন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফর পিস নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির কর্মসূচি সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

উইমেন ডেলিভার নির্বাচিত তরুণদের কাজ ও উদ্যোগকে সম্প্রসারিত করতে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, তহবিল প্রদানসহ বিভিন্ন সুযোগ করে দেবে। সেই সঙ্গে নারী ও তরুণীদের সমতা ও অধিকার বিষয়ক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সম্মেলন 'উইমেন ডেলিভার কনফারেন্স ২০২২'এ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন নির্বাচিত তরুণেরা। ■

তেলাপোকার ১৪ পা!

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

তোমরা তো সবাই তেলাপোকা চিনো তাই না বন্ধুরা। তেলাপোকা হচ্ছে এক ধরনের ক্ষতিকর পোকা। যেটির বসবাস সাধারণত ময়লা আবর্জনায়, বাড়ির আলমারির চিপায়, রান্নাঘরের সিঙ্কের তলায়। কিন্তু অতি সম্প্রতি গভীর সমুদ্রে অবিকল তেলাপোকার মতো দেখতে একটি প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা তা কি তোমরা জানো? হ্যাঁ বন্ধুরা, ভারত মহাসাগরের একটি অংশে দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে তেলাপোকার মতো নতুন প্রজাতির প্রাণীটি ধরেছেন সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একদল সমুদ্র বিজ্ঞানী।

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম জাভা এলাকায় ২০১৮ সালে এই প্রাণীটি প্রথম পাওয়া যায়। প্রথম দেখায় মনে হয় জীবটি যেন মাথায় হেলমেট পড়ে আছে। সিঙ্গাপুরের গবেষকরা একটি নতুন প্রাণীর আবিষ্কার হিসেবে চিহ্নিত করে এটির নাম দিয়েছেন 'বাথিনোমাস রাকসাস'। একটি বিশালাকার সামুদ্রিক তেলাপোকা তেলাপোকা।

বিজ্ঞানী ও গবেষকরা ৮ই জুলাই এই নতুন প্রজাতি সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এ খবর বায়োডাইভারসিটি রিসার্চ জার্নাল 'জুকিজ'-এ প্রকাশিত হয়।

এটি সাধারণ তেলাপোকা নয়। অনেকটা তেলাপোকার মতো দেখতে হলেও পায়ের সংখ্যা ৬ এর বদলে ১৪টি। মুখের সামনে বিশাল দুটি শুঁড় রয়েছে। অনেকটা সামুদ্রিক লবস্টারের সাথে মিল আছে। এই প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে বাথিনোমাস রাকসাস। বাথিনোমাস গোত্রের প্রাণীরা নতুন নয়। এই তেলাপোকা আসলে বাথিনোমাসদেরই রাক্ষুসে প্রজাতি।

বাথিনোমাস এক ধরনের বিশালাকার জীব। এই জীবের মধ্যে প্রায় ২০ ধরনের প্রজাতি রয়েছে। এগুলো এক ধরনের মাংসাশী পোকা। সাগরের খুব শীতল স্থানে এগুলোর বাস। প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে এদের বাস। ১৪টি পা যুক্ত এই তেলাপোকা সমুদ্রের গর্ভে পা চালিয়ে খাবারের খোঁজ করে। এদের মাথায় হেলমেটের মতো একটি বস্তু আছে। সেখানেই রয়েছে একাধিক চোখ। সামুদ্রিক তেলাপোকারা সাধারণত ৩৩ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। যা মানুষের একটা পায়ের পাতার সমান। কোনো কোনোটা ৫০ সে.মি.ও হয়। তবে এগুলোর সংখ্যা কম। এরা সামুদ্রিক মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ খেয়ে বেঁচে থাকে। দীর্ঘ সময় এরা কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। বাথিনোমাসরা হলো সমুদ্রের ক্রাস্টাসিয়ান। ক্রাস্টাসিয়ান প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী। সন্ধিপদ পর্বের অংশ। যেমন: সামুদ্রিক লবস্টার, কাঁকড়া, শ্রিম্প ইত্যাদি। বাথিনোমাস রাক্ষস বা ৫০ সে.মি মিটারের এই বিশেষ তেলাপোকাকে সুপার জায়েন্টও বলা হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

মো. জামাল উদ্দিন

বিশ্বব্যাপী করোনার প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আমাদের দেশেও করোনার আক্রমণ হয়েছে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো হিমশিম খাচ্ছে করোনা রোগীর চিকিৎসা দিতে গিয়ে। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত প্রতিরোধের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। তাই আজ তোমাদেরকে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে জানাব।

খাদ্যাভ্যাস

সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। প্রচুর শাকসবজি ও ফলমূল খাবে। ফলের রসের পরিবর্তে গোটা ফল চিবিয়ে খেলে ভালো। এতে পুষ্টির সঙ্গে ফাইবারও পাওয়া যাবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করবে ৮-১০ গ্লাস। ফাস্ট ফুড, অতিরিক্ত তেল-চর্বি ও মশলা খাবার যতটুকু সম্ভব পরিহার করবে।

ভিটামিনস ও মিনারেল

এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভিটামিন সি

প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে টক জাতীয় ফল, যেমন- লেবু, কমলা, মাল্টা, আমড়া, জাম্বুরা ইত্যাদি।

ভিটামিন ডি

এর প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে সূর্যরশ্মি যা সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শরীরের কিছু অংশ উন্মুক্ত করে (যেমন মুখমণ্ডল, হাত ও ঘাড়) তোমরা রোদ লাগাতে পারো। এছাড়াও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার যেমন- ডিমের কুসুম, মাছের তেল, ওমেগা-৩, গরুর কলিজা, চিজ এগুলো খেতে পারো।

জিংক

ফ্লু বা সর্দি-কাশি উপসর্গে, জিংকের বেশ উপকারিতা রয়েছে। জিংক সমৃদ্ধ খাবারগুলো হচ্ছে- আদা, রসুন, বাদাম, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি।

মধু

মধুতে এমন কিছু জীবাণু ধ্বংসকারী উপাদান রয়েছে যেমন- হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড যা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে কাজ করে।

প্রোবায়োটিভ

যেমন- দই, চিজ ইত্যাদি খাবারে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অটুট রাখতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার বিকল্প নেই। খাবার পরিমিত খাও ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকো।

ঘুম

মনে রাখবে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রতিদিন অন্তত ৮ ঘণ্টা করে ঘুমানোর চেষ্টা করো। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

আমরা যদি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চাই তাহলে নিজের ও আশপাশের পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। নির্দিষ্ট সময় পর পর হাত সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তোমাদের নিজেদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করে নাও। দরজার হাতল, সুইচ, লিফটের বাটন জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার রাখো ও মাস্ক ব্যবহার করো। এ সময়ে এসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। কারণ প্রতিকার নয় প্রতিরোধ উত্তম। ■

দশদিগন্ত

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

প্রধানমন্ত্রীর অফিসিয়াল ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার অফিসিয়াল ছবি রিলিজ করা হয়েছে। এখন থেকে এই ছবিটি অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ২১শে জুলাই ছবিটি রিলিজ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি পোস্ট করেন। পোস্টে লেখেন, 'এখন থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ছবিটি অফিসিয়াল ছবি হিসেবে ব্যবহার করা হবে।'

মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক

করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) এখন বিশ্বের একটি ভয়ংকর মহামারির নাম। এখন পর্যন্ত এর কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়ায় মাস্ক পড়া, হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে এর প্রতিরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাই বাংলাদেশ সরকার সব জায়গায় মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। ২১শে জুলাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে এক পরিপত্র জারি করা হয়।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, সব ধরনের অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অফিসে আগত সেবা গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া সব হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, শপিংমল, বিপণিবিতান, দোকান, হাটবাজার, গণপরিবহণ, গার্মেন্টস, হকার, রিকশা, ভ্যান, পথচারী, হোটেল-রেস্টুরেন্টে আগতদেরও আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। তোমরা কিন্তু বাইরে বের হলে মাস্ক পড়তে ভুলো না।

হাজার টাকার নতুন নোট

বন্ধুরা জানো কি, বাজারে এসেছে ১ হাজার টাকার নতুন নোট। দেশের সর্বোচ্চ মূল্যমানের নোট ১ হাজার টাকা। তবে নতুন এ নোটের রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক নিরাপত্তা সুতা আরো উন্নত করা হয়েছে। যার ফলে সহজেই এই নোটকে জাল করা সম্ভব হবে না।

২১শে জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির স্বাক্ষরিত নতুন এই নোটটি বাজারে ছাড়া হয়েছে। নতুন করে সংযুক্ত নিরাপত্তা সুতাটি ৫ মিলিমিটার প্রশস্ত। এ সুতায় 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' এবং '১০০০ টাকা' খঁচিত নতুন এ সুতাটি নখের আঁচড়ে বা মুচড়িয়ে সহজে উঠানো সম্ভব হবে না। এ নোটের রং, ডিজাইন ও অন্যান্য সব নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রয়েছে। এই নতুন ১ হাজার টাকার নোটের পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত ১ হাজার টাকা মূল্যমানের অন্যান্য নোটসমূহ চালু থাকবে।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, ৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় মেহেরপুর জেলার যে স্থানে প্রথম স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়

উপর-নিচ: ১. বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের নাম, ২.বঙ্গবন্ধু যে কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, ৪. শেখ মুজিব ছয় দফা দাবি কোথায় উপস্থাপন করেন

		১.					২.
৩.							
					৪.		
৫.							

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে-সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত:

শেখ ফজিলাতুন্নেসা, মুজিবনগর, হাসিনা, নীলনকশা, অশেষ

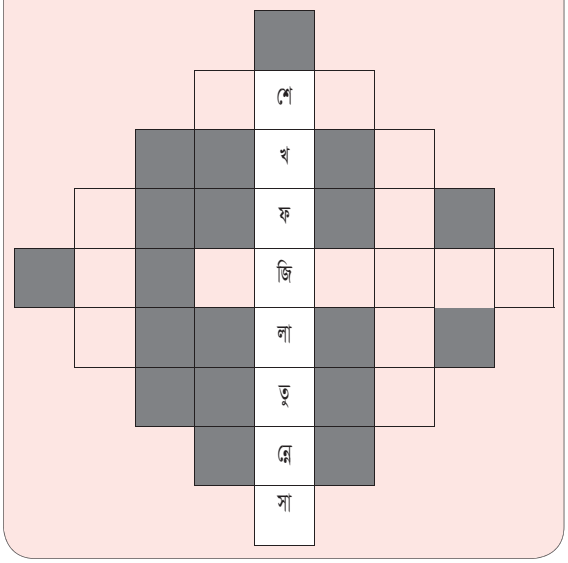

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৬	*		-	৮	=	
+		*		/		/
	+	৫	-		=	৪
-		-		+		+
৪	+		-	৪	=	
=		=		=		=
	-	৪	+		=	৭

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		৯		৩৭				৪১
	৭		১১		৫১		৪৯	
৩		১				৫৩		
১৬		১৪			৫৫			
	৩০			৩৩		৫৭		৪৫
	২৯		৭৩		৭১		৫৯	
		২৭		৭৫		৬৯		
	২৫		৭৭		৮১		৬৭	
২১		২৩		৭৯		৬৫		৬৩

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয় উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

জুলাই ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধা

বা	ং	লা	দে	শ			
ন্দ			শ		গ		
র			লা	ঠি	য়া	ল	
বা		সু	ই				
ন		ল					
		ক্ষ	ণ	জ	ন্মা		শ্বা
প্র	মা	ণ		ল			প
ভা				জ	ন	প	দ

ছক মিলাও

				কি				
				ং				
		উ	প	ক	র	ণ		
		ট		র্ত			কা	
ব	স	চা		ব্য		গ	র	ম
		ল		বি	ব	র	ণ	
		ক		মৃ		ল		
				ঢ়				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৫	*	১	-	২	=	৩
+		*		*		*
৩	+	২	-	১	=	৪
-		-		+		-
২	+	১	-	৩	=	০
=		=		=		=
৬	+	১	+	৫	=	১২

নাম্ব্রিক্স

৬৩	৬৪	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭	৬	১
৬২	৬৫	৬৬	৭৩	৭২	৭১	৮	৫	২
৬১	৬০	৭৫	৭৪	৮১	৮০	৯	৪	৩
৫৮	৫৯	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	১০	১৩	১৪
৫৭	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	১১	১২	১৫
৫৬	৪৫	৪৬	৩৭	৩৮	৩৯	২৬	২৫	১৬
৫৫	৪৮	৪৭	৩৬	৩৫	২৮	২৭	২৪	১৭
৫৪	৪৯	৫০	৩৩	৩৪	২৯	২২	২৩	১৮
৫৩	৫২	৫১	৩২	৩১	৩০	২১	২০	১৯

নুরুন নাহার (নূহা), প্রথম শ্রেণি, কান্দিরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিল্লা।

আমিমুল ইসলাম বুসনিয়া, প্রথম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুগদা শাখা, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন

১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন

www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-2, August 2020, Tk-20.00

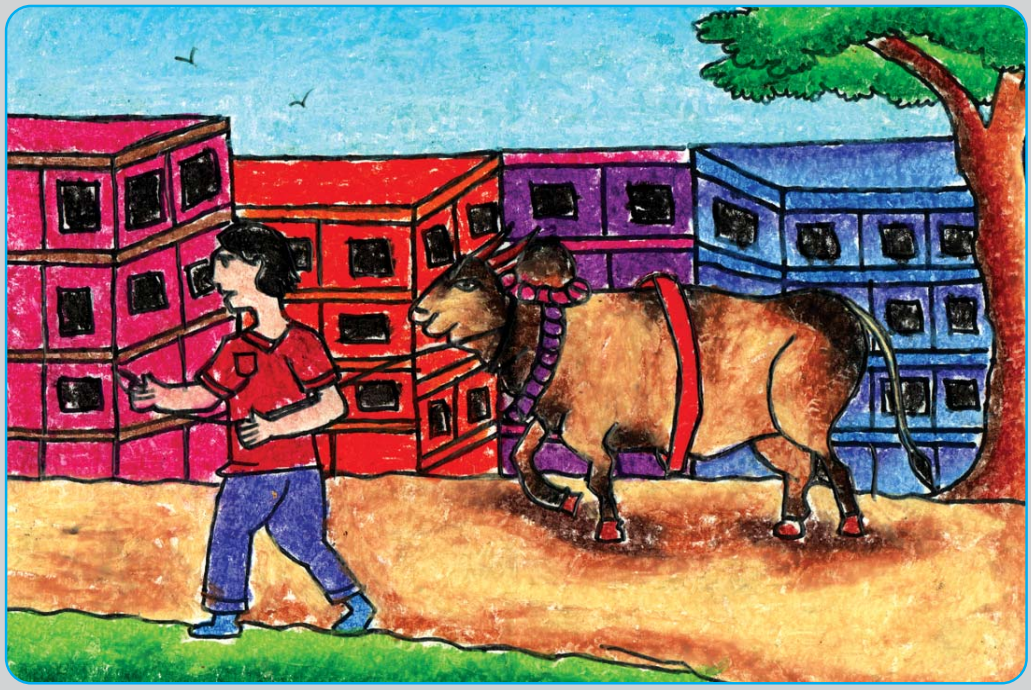

মীর্জা মাহের আসেফ, পঞ্চম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা